পূজার পড়া

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী
প্রণীত

১৩৩৭

মূল্য বার আনা

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ধর
আশুতোষ লাইব্রেরী,
৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ঢাকা ও চট্টগ্রাম

প্রিণ্টার
শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র সুর
আশুতোষ প্রেস, ঢাকা

উপহার পৃষ্ঠা

শ্রী হরি

শ্রী .... কে

সাদরে

অর্পণ করিলাম

ইতি—

সন ১৩৩ শ্রী

সূচীপত্র

পূজার পড়া

ল-সং

তোমার নামটা পড়িয়াই হাসিও না। নামটা কতক অংশে চীনাদের নামের মত বটে, কিন্তু সত্য সত্য তাহা নহে। উহা বাঙ্গালার স্বাধীন রাজার—সুতরাং স্বাধীন বাঙ্গালীজাতির একটা কীর্ত্তি। বাঙ্গালীজাতির বলবীর্য্য ও দিগ্বিজয়ের উহা অভ্রান্ত প্রমাণ।

বল্লাল সেন বাঙ্গালার রাজা হইয়া কয়েক বছর পরেই মিথিলা অর্থাৎ বর্ত্তমান বিহার দেশ আক্রমণ করেন। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জিলার রামপাল নামক স্থানে ছিল তাঁহার রাজধানী। এই রামপাল হইতেই বঙ্গের রাজা সৈন্য-সামন্ত অস্ত্রশস্ত্র রসদ লইয়া—বীরদর্পে বসুমতী কাঁপাইয়া

বিহার দখল করিতে গিয়াছিলেন। কথাটা শুনিয়া তোমাদের আনন্দ হয় না কি ?

তখনকার দিনে রেল ছিল না—ষ্টীমার ছিল না—শুধুই পায়ে-হাটা পথ ছিল। কাজেই দূরদেশে বেড়াইতে যাইতে যেমন কষ্ট হইত, যুদ্ধে যাইতে হইলে কষ্ট হইত তার চেয়ে কত বেশি—তাহা তোমরা অবশ্যই বুঝিতে পার। যাহা হউক—বল্লাল সেন তো বাঙ্গালা হইতে যাইয়া মিথিলাতে চড়াও হইলেন। সেখানকার রাজাও নিজের দেশ রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিল।

বাঙ্গালীদের যুদ্ধের বাহাদুরী এবং বলবীর্য্য ও কৌশল দেখিয়া বিহারের রাজা বিপদ্ গণিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, এ যাত্রা আর রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব নহে। তিনি শত্রু-পক্ষকে জব্দ করিবার জন্য ফন্দী আঁটিলেন। একটা গুপ্ত-চরকে দ্রুতগতি বাঙ্গালার রাজধানীতে যাইয়া বল্লালের মৃত্যু সংবাদ রটনা করিতে উপদেশ দিলেন। গুপ্তচরও তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালায় চলিয়া গেল।

ফলে বাঙ্গালাদেশে—বল্লালের রাজধানীতে খবর পৌঁছিল, যে, মিথিলার যুদ্ধে রাজা বল্লালের মৃত্যু হইয়াছে। খবর শুনিয়া কেবল রাজপুরীর নহে—দেশের সকলেরই মুখ শোক-দুঃখে কালো হইয়া গেল। অথচ অত দূরদেশের খবর বলিয়া, অনেকে রাজার মরণের খবর সত্য বলিয়া বিশ্বাস

করিতে চাহিল না। ঠিক খবর জানিবার জন্য সবাই ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ঠিক এই সময়েই রাজপুরীতে আর একটা অতি সুখের ব্যাপারও ঘটিল। বল্লালের মহিষী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। রাজার মরণ-সংবাদে রাজমন্ত্রীরা বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কারণ রাজা বল্লালের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। এক্ষণে রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মন্ত্রীরা তাহাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, কারণ সিংহাসন তো আর রাজাশূন্য থাকিতে পারে না। আর মরণ-সংবাদ সত্য কিনা তাহা জানিবার জন্য মিথিলায়ও লোক পাঠাইলেন।

যথাকালে দূত যাইয়া মিথিলায় হাজির হইল। তখন মিথিলায় বাঙ্গালার সেনাগণের অনবরত আমোদ আহ্লাদ চলিতেছিল। কেননা মিথিলার রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সে রাজ্য দখল করা হইয়াছিল। এই আনন্দের মধ্যে পুত্রের জন্ম সংবাদ পাইয়া রাজার ও সৈন্য সামন্তগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না—তখন উৎসবের উপর উৎসব চলিল।

মিথিলা-বিজয় এবং পুত্রের জন্ম একই সময়ে হওয়াতে, মহারাজ বল্লাল এই বছরটাকে চিরস্মরণীয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সেই ইচ্ছা সফল করিবার জন্য এই বছর হইতে নূতন জয় করা মিথিলা রাজ্যে একটা নূতন সন প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাহার নাম দেওয়া হইল "লক্ষ্মণ-সম্বৎ", কারণ

নবজাত রাজকুমারের নাম রাখা হইয়াছিল লক্ষ্মণ। আজিও মিথিলাবাসীরা প্রতিদিনের ব্যাপারে, পঞ্জিকায়, এই সনের উল্লেখ করে, কাগজ পত্রে লিখিয়া থাকে। কথাটা একটু বড় বলিয়া মিথিলাবাসী উহাকে সঙ্ক্ষেপে লিখিয়া থাকে 'ল-সং'।

বাঙ্গালাদেশবাসীরা যে বাঙ্গালার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত বিক্রমপুর হইতে যাইয়া সুদূর মিথিলা রাজ্য বাহুবলে দখল করিয়াছিল, ল-সং তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ, অভ্রান্ত প্রমাণ। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১৩৩৬ সনে ৮২১ ল-সং চলিতেছে। সুতরাং ৮ শত বছর আগে বাঙ্গালীরা কেমন ছিল, তাহা তোমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছ।

দাতা বটে

(১)

তোমরা দিল্লীর সম্রাট্ হুমায়ুনের নাম শুনিয়াছ। এক-বার তিনি শত্রুর আক্রমণে এমনি আট্‌কা পড়িয়াছিলেন, যে, গঙ্গায় সাঁতার কাটিয়া তাঁহাকে প্রাণ বাঁচাইতে হইয়া-ছিল। হুমায়ুন যখন গঙ্গার জলে ভাসিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে এক ভিস্তিও তাহার চামড়ায় মশকটি বাতাসে পূর্ণ করিয়া গঙ্গা পার হইতেছিল। দৈবগতিকে ভিস্তি আসিয়া বাদশা হুমায়ুনের গায়ে লাগিল; বাদশা তাহাকে সহায় পাইয়া গঙ্গা পার হইলেন, প্রাণ বাঁচাইলেন। শেষে বিদায় লইবার কালে ভিস্তিকে দিল্লী যাইতে বলিয়া গেলেন।

গোলযোগ থামিয়া গেল, হুমায়ুন আসিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। একদিন সেই ভিস্তি আসিয়া উপ-স্থিত হইল। ভিস্তি দেখিল, সে যাহাকে ভিস্তিতে করিয়া গঙ্গা পার করিয়া দিয়াছিল, সেই ব্যক্তি আর কেহ নহেন, স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহ।

বাদশাহ ভিস্তিকে পুরস্কার দিতে চাহিলে, সেও সুযোগ বুঝিয়া এক দিনের জন্য বাদশাহী চাহিয়া বসিল! হুমায়ুন কথা দিয়াছিলেন, কাজেই তাহা নড়চড় করিতে পারিলেন না, এক দিনের জন্য প্রাণদাতা ভিস্তিকে বাদশাহী তক্ত ছাড়িয়া দিলেন। ভিস্তি ঐ একদিনের বাদশাহী পাইয়াই আত্মীয়স্বজনাদির সুযোগ সুবিধা করিয়া লইল। সত্য রক্ষার জন্য এত বড় একটা মহাপ্রাণতা বা দানের উদাহরণ ভারতবর্ষ ছাড়া জগতের কোন দেশের ইতিহাসে নাই। তোমরা বল ত হুমায়ুন কেমন দাতা ?

(২)

মহারাজ বল্লাল সেন যখন বাঙ্গালার রাজা, তখন তিনি যে একটা দান করিয়াছিলেন, তাহা বাদশাহ হুমায়ুনের দানের চেয়ে কোন অংশে কম নহে। বাদশাহ হুমায়ুনের জন্মের ঠিক্ ঠিক্ চারিশত বৎসর আগে, এখন হইতে আটশ' বছরেরও বেশি আগে, বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন জন্মিয়াছিলেন। বল্লালের দানের কাহিনীটি বড় চমৎকার।

কোন কারণে পিতা বল্লালের সহিত, পুত্র লক্ষ্মণ সেনের মন কষাকষি হয়। তেজস্বী যুবক পুত্র নির্ভীকভাবে পিতার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। রাজা মনে করিলেন, ছেলে হইয়া বাপের উপর বিচার আলোচনা বে-আদপি, সুতরাং তিনি ছেলেকে নির্ব্বাসিত করিলেন। লক্ষ্মণ একাকী

পিতার রাজপুরী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বালিকা স্ত্রীকে পিতার পুরীতেই রাখিয়া গেলেন।

কিছুকাল গেল। রাজা যথারীতি রাজ্যের শাসন-পালন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ সেনের কথা কেহ বড় আর মনে করিত না, সকলেই উহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু বালিকা বধূটি ক্রমে বড় হইয়াছে, সে তো আর স্বামীর কথা ভুলিতে পারিতেছে না। দিনরাত তাহার মনে স্বামীর কথা জাগিতেছিল, অথচ মুখ ফুটিয়া সে কাহারো কাছে সে কথা বলিতে পারিতেছিল না। অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়াও সে অসীম ধৈর্য্যের সহিত বাহিরে নিশ্চিন্তভাব দেখাইতেছিল।

যায় দিন। বর্ষাকাল উপস্থিত। মেঘে আকাশ ঘেরা —দিন রাত ঝর্ ঝর্ ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে— মেঘের গভীর গর্জ্জনে জল-স্থল-আকাশ কাঁপিতেছে। এমনি দিনে মহারাজ বল্লাল অন্তঃপুরে খাইতে বসিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল সম্মুখের দেয়ালের উপর—তিনি দেখিলেন —দেয়ালের গায়ে একটা সংস্কৃত শ্লোক লেখা রহিয়াছে।

পতত্যবিরতং বারি, নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা, দুঃখশান্তিং করিষ্যতি॥

অবিরল পড়ে জল
হর্ষে নাচে শিখিদল ;
(আজি) বিনা কান্ত কি কৃতান্ত
দুঃখ নাহি হবে শান্ত।

উহা পড়িয়াই তিনি বুঝিলেন, এ লেখা—এ মর্ম্ম-কাহিনী. তাঁহার পতিবিরহিণী বধূমাতার। রাজার আর খাওয়া হইল না -তৎক্ষণাৎ খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া তিনি রাজ-সংসারের বেতনভোগী মাঝিদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন—"যে কাল সূর্য্য উঠিবার আগে লক্ষ্মণকে রাজধানীতে আনিয়া দিতে পারিবে—তাহাকে পুরস্কার দিব আমার রাজ্যের একটা অংশ।"

মাঝিদের মধ্যে একজনের নাম ছিল—"সূর্য্য"। জাতিতে সে কৈবর্ত্ত বা ধীবর—সোজা কথায় জেলে। কাজটা সোজা তো নহেই—বরং অসম্ভব। তবু সূর্য্য মাঝি রাজার অনুজ্ঞা মাথায় লইয়া তৎক্ষণাৎ যুবরাজ লক্ষ্মণকে আনিবার জন্য নৌকা ভাসাইল। নৌকার কাণার উপর যতটা জায়গা ছিল, তাহা দাঁড়ে দাঁড়ে ভরিয়া দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে জেলেনৌকা ঝড়ের বেগে চক্ষুর অগোচর হইয়া গেল। সে রাত্রে আশা ও উৎকণ্ঠায় রাজপুরীতে কাহারো ঘুম আসিল না। তারপর আকাশে সূর্য্য উঠিবার আগেই ধীবর-মাঝি সূর্য্য, যুবরাজ লক্ষ্মণকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল। আনন্দ-কোলাহলে সেই বিশাল রাজপুরী ভরিয়া গেল!

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য মাঝিকে রাজ্যের একটা অংশ দান করিলেন। সূর্য্য রাজদত্ত অধিকার পাইয়া প্রাপ্তদেশ দখল করিল—একটা রাজত্ব স্থাপন করিল। যে জায়গাটা সূর্য্য মাঝি দানে পাইল, তাহার নাম ছিল যোগীন্দ্র-দ্বীপ;

এক্ষণে সূর্য্য মাঝি তাহার নাম দিল সূর্য্যদ্বীপ। সূর্য্য যে স্থানে নিজের রাজধানী স্থাপন করিল—উহার নাম মহেশপুর। বর্ত্তমান যশোহরের সদর বিভাগ, বনগাঁ ও নড়াইলের অধিকাংশ লইয়া প্রাচীন সূর্য্যদ্বীপ গঠিত ছিল। মহেশপুর বনগাঁ হইতে মাইল কুড়ি উত্তরে—আর চৌগাঁ হইতে মাইল সাতেক উত্তরপূবে অবস্থিত।

আজও মহেশপুরে রাজা সূর্য্যমাঝির খনিত যে দুটী পুকুর আছে—উহার একটীর নাম যোগীন্দ্র—আর একটীর নাম যোগিনীদহ। রাজবাড়ীর চারিপাশে যে গড়খাই ছিল, এখনো তাহা বর্ত্তমান—পরিখা-বেষ্টিত রাজপুরী এখন ঘোরতর জঙ্গলে ভরা—নানা হিংস্রপ্রাণীর বাসস্থান। আজও লোক সেই গড়বেষ্টিত অরণ্য দেখাইয়া বলে, "অই সূর্য্যের বেড়।"

এভাবে প্রতিজ্ঞাপালন—গুণের পুরস্কারে রাজ্যের অংশ দান করিয়া, মাঝিকে স্বাধীনরাজা করিয়া দেওয়া—কত বড় দাতার এবং কত বড় মহত্ত্বের পরিচয়—তাহা বুঝিয়া লও। তোমরা ভাল করিয়া ইতিহাস পড়িলেই এ সকল কথা জানিতে পারিবে।

জগজ্জয়ী বাঙ্গালী বীর।

(১)

শিশুসাথীর পাঠকপাঠিকাগণ, (১৩২৯ সন) মাঘ মাসের শিশুসাথীতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচরণ গুহ ওরফে 'গোবর' বাবুর বিষয় পড়িয়াছ। তার আগে ভীম ভবানীর কথাও জানিয়াছ। এবার তোমাদিগকে গোবর সম্বন্ধে আর গোটা দুই খবর বলিব।

কয়েকমাস আগে আমেরিকায়, গোবরের সহিত—সে দেশের দুজন কুস্তিগিরের কুস্তি হইয়া গিয়াছে। বলিতে পার কি—সে কুস্তিতে কাহার জয় হইয়াছে? লালপাগড়ি দেখিলে যাহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলায়—ধমকের চোটে যাহাদের প্লীহা ফাটে বলিয়া গল্প আছে, এই লড়ায়ে কিন্তু সেই ডাল-ভাত খাওয়া বাঙ্গালী গোবরই জয়ী হইয়াছে!

যে দুজনের সঙ্গে লড়াই হয়—তাদের একজনের নাম জন্ হেকেন্স্মিথ্, অন্য জনের নাম মণ্ড্। হেকেন্স্মিথ্ সাহেব আমেরিকার চিকাগো সহরের পালোয়ান। এই চিকাগো

সহরেই আর একবার একজন বাঙ্গালী জগতের সকল ধর্ম্ম-যাজকদিগকে পরাস্ত করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন।

জন্ হেকেন্স্মিথ্ নাকি সে দেশের খুব বড় পালোয়ান। কিন্তু ডাকনাম হিসাবে তাহার চেহারাটা তেমন বড় নহে। আমাদের যতীন্দ্রচরণের বিশাল দেহ দেখিলে অনেক লোককেই পগার পার দিতে হয়! তোমরা তো যতীন্দ্রচরণের নাম শুনিয়াছ আর কুস্তির কথা মাত্র পড়িয়াছ—ছবিটা পর্য্যন্ত দেখ নাই! এবার তোমাদের সে দুঃখ রাখিব না, অই অপর পৃষ্ঠায় দেখ আমাদের বিশ্ববিজয়ী যতীন্দ্রচরণ গুহ ওরফে গোবর।

এখন কুস্তির কথাটা শোন। হেকেন্স্মিথের সঙ্গে কুস্তি লড়িবার আগে এই বাজি থাকে যে, এক ঘণ্টার মধ্যে গোবর উহাকে চিৎ করিয়া ফেলিবে।

(২)

খেলা আরম্ভ হইল। দুই জনেই দুইজনের উপর নানারকম প্যাঁচ খেলিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই বিপক্ষকে কাবু করিতে পারিলেন না। একে তো আমেরিকা আমাদের পক্ষে বিদেশ বিভূঁই; তার উপর আবার সে দেশের লোকেরা নিজেদের দেশের লোকের দিকে কি ভাবে পক্ষপাত করে, সে বিবরণ তো গেলবারেই কতক জানিয়াছ। এবারও দর্শকগণ একধারা চীৎকার চেঁচামিচি করিয়া—গোবরকে পাক্‌রাও করিতে—ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিতে—হেকেন্-

গোবর

স্মিথের উপর হুকুম করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সব হুকুম গোবরের বাহুবলের কাছে একেবারে 'নস্যাৎ' হইয়া গেল! লাভের মধ্যে হেকেন্ গোবরকে ধরিতে গেলে, তিনি উহার ঠ্যাং ধরিয়া বেশ্ কয়েকটি আছাড় মারিয়া দিলেন! এই ভাবে কুস্তি করিতে করিতে—আধ ঘণ্টার একটু বেশি সময়ের মধ্যে গোবর পায়ের প্যাঁচে হেক্‌কে চিৎ করিয়া ফেলিলেন। স্বজাতির বড়াই করিবার মত বীর হেকেন্‌স্মিথ্ হারিয়া গেল দেখিয়া, দর্শকেরা তো রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া গেল।

তারপর মণ্ডের সহিত কুস্তির কথা। তাহাতে বাজি ছিল, তিনবারের মধ্যে প্রতিপক্ষকে যে দুবার চিৎ করিতে পারিবে, তাহারই জিৎ হইবে। খেলা আরম্ভের কয়েকমিনিট মধ্যেই মণ্ড্ গোবরকে চিৎ করিয়া ফেলিল। একবারের খেলা শেষ হইয়া গেল। দ্বিতীয় বারের খেলায় প্রায় বিশ মিনিট পরে গোবর মণ্ডকে চিৎ করিয়া ফেলিলেন। এখন শেষবারের খেলার উপরই হার জিৎ রহিল, সুতরাং দুজনে খুব হুঁসিয়ার হইয়া তৃতীয় বারের খেলা আরম্ভ করিলেন। পনের মিনিটের মধ্যেই গোবর মণ্ডের পা ধরিয়া এক আছাড়! আর তাকে চিৎ করে চেপে ধরা! কাজেই জিৎ—জিৎ—গোবরেরই জিৎ হইল!

চেষ্টার অসাধ্য যে কাজ নাই, তাহা এই সকল ব্যাপারেই তোমরা বুঝিতে পার। কেবল বই লইয়া বসিয়া থাকিলে,

কাগজে লেখা একখানা প্রশংসাপত্র পাওয়া যায় বটে; হাত পা নাড়িয়া সংসারে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার বড় কিছু তাহাতে ফলে না। যদি লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পাগুলি বেশ্ ভালরকমে নাড়াচাড়া করিতে পার বলিয়া কেহ প্রশংসাপত্র পাও, তবে তাহাকেই বলিব 'একটা মানুষের মত মানুষ।' শিশুসাথীর শিশু পাঠকপাঠিকাগণও ভীম ভবানী, গোবর প্রভৃতির মত শরীরের বল বাড়াইতে চেষ্টা করুক, ইহাই আমাদের কামনা।

কলির ভীম

তোমরা মহাভারতের পাণ্ডবগণের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। মধ্যম পাণ্ডব—দাদা আর গদার মালিক—ভীমসেনের নামও তোমরা বেশ্ জান। তাঁহারা ছিলেন সেকালের লোক—বাড়ী ছিল হস্তিনাপুরে—বর্ত্তমান দিল্লীর কাছে। কিন্তু একালে আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালীর ভিতরেও যে ভীম আছে, তাহা হয়তো তোমরা জান-ই না। আজ তোমাদিগকে এক বাঙ্গালী ভীমের কথা শুনাইব।

আমাদের এই বাঙ্গালী ভীমের নাম ভবেন্দ্রমোহন সাহা, ডাক নাম ভবানী বা ভীম ভবানী। ইহার জন্মভূমি কলিকাতা। ভীম ভবানীর বয়স এক্ষণে সবে একত্রিশ বছর হইয়াছে। পরের পৃষ্ঠার ছবিখানি দেখিলেই তোমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, ভবানী সত্যই ভীম কি না!

কলিকাতারই দর্জ্জিপাড়ার গুহবাবুদের আখড়ায় ভবানী বাবু কুস্তি শিখিয়াছেন—শরীর গড়িয়া তুলিয়া বীরের সমাজে খ্যাতি পাইয়াছেন। ১২।১৩ বছর আগে, যখন ভবানীর বয়স

মাত্র ১৯ বছর, তখন তিনি সুপ্রসিদ্ধ খেলোয়ার রামমূর্ত্তির দলে প্রবেশ করেন। তারপর বসাকের হিপোড্রাম সার্কাসে ঢুকিয়া কিছুদিন খেলা দেখান। এক্ষণে ভবানী সপ্তাহে দেড়শ টাকা মাহিয়ানায় আগাসী সার্কাসে খেলা দেখাইতেছেন।

ভবানী, সাধারণতঃ যে পোষাক পরিয়া সার্কাসে খেলা দেখাইয়া থাকেন—ছবিতেও তাহাই আছে। ভবানী এশিয়া মহাদেশের নানাস্থানে খেলা দেখাইয়া অনেক সোনা ও রূপার পদক এবং প্রচুর টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

ভীম ভবানী একসঙ্গে তিনখানা মটর গাড়ী অচল করিয়াছিলেন, ষোল আনা বেগ দিয়াও একখানা গাড়ীও চুলমাত্র চালান যায় নাই! ২০ মণ ভারি পাথর বুকের উপর রাখিয়া তাহার উপর ২০।২৫ জন লোককে বসাইয়া গান-বাজনা করাইয়াছিলেন; হাতী বুকে তুলিয়াছিলেন। এইরূপ কত কাণ্ড তিনি করিয়াছেন।

গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি দিন ভবানী টিটাগড়ের জমিদার বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানা মোটর গাড়ী অচল করিয়া দুই শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। যে গাড়ীখানা তিনি চলিতে দেন নাই, সেখানা ৩৫টী ঘোড়ার যত বল, তত বলে চলে। কাজেই ঐ গাড়ীখানা থামানও যা পঁয়ত্রিশটী ঘোড়াকে একসঙ্গে আটকাইয়া রাখাও তা। লাগাম টানিয়া লোকে একটা ঘোড়াকে থামাইয়া রাখিতে

পারে না—আর ভবানী পঁয়ত্রিশটা ঘোড়া থামাইতে পারেন !! ভবানীর গায়ে কত বল তাহা বুঝিতে পারিলে ত ?

সহরের রাস্তায় মই দিবার জন্য যে লোহার রোলার থাকে, তাহা তোমাদের অনেকে দেখিয়াছ। ঐ ভাদ্রের সংক্রান্তি দিনই ভবানীর বুকের উপর দিয়া একটি রোলার চালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তোমরা জান ইংরাজি ওজনের এক টনে আমাদের ২৭। সোয়া সাতাশ মণ হয়। ভবানীর বুকের উপর যে রোলার চালান হয়, সেটার ওজন ৪ টন অর্থাৎ ১০৯ একশ নয় মণ !! চারি পাঁচ হাজার লোক এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত কোন পালোয়ানই এত বড় ভারী জিনিষ বুকে লইতে সাহসী হন নাই।

স্কুলকলেজের পড়া শেষ করিয়া—দৃষ্টিশক্তির অভাবে চশমাধারী—পরিপাক শক্তির অভাবে সাগুবার্লি বা ছটাক চালের ভাত ও পোনা মাছের ঝোলসেবী—ছুঁচোর চীৎকারে মূর্চ্ছাগত—শত সহস্র যুবকের অপেক্ষা একটা ভীমভবানী যে লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ, শিশুসাথীর পাঠকপাঠিকাগণ! তাহা তোমরা বুঝিয়া রাখিও। তোমরাও ভবানীর মত বীর হইয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করিও। *

* দুঃখের বিষয় এই যুবক ভীম অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

আদর্শ আশুতোষ

অভাব না হইলে কোন জিনিষের মূল্য বুঝা যায় না। আজ কতদিন হইল ১৩৩১ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন—কিন্তু বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রতিঘরে আজিও শোকের দীর্ঘনিঃশ্বাস তেমনি সমভাবে পড়িতেছে। তিনি বাঙ্গালীর কি ছিলেন— কত বড় শক্তি ছিলেন—কিরূপ আশ্রয় ছিলেন—বাঙ্গালার লোকেরা বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালীরা আজ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। আশুতোষ জীবিত থাকিতে কিন্তু কেহ এতটা বুঝে নাই—তিনি যে কি অমূল্য রত্ন ছিলেন, তাহা ধারণা করিতেও পারে নাই।

বাঙ্গালার লোককে যদি যথার্থ মানুষ হইতে হয়, তাহা হইলে স্যার আশুতোষের আদর্শ লইতে হইবে। কেননা, তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায়, শক্তি, স্বজাতি-প্রীতি, স্বদেশ-প্রীতি, জাতীয়তা রক্ষা প্রভৃতি গুণে অদ্বিতীয় ছিলেন। শিশু-সাথীর প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ, তোমরা আশুতোষের জীবনের অনেক কথা শুনিয়াছ—আমিও আজ তোমাদিগকে তাঁহার আদর্শ জীবনের আরো কতকগুলি কথা শুনাইব।

আশুতোষের পিতার নাম ছিল গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ডাক্তার। ইঁহাদের পৈতৃক বাসস্থান হুগলি জিলার অন্তর্গত বলাগড় গ্রাম। চিকিৎসা ব্যবসায় উপলক্ষে গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতায় আসেন। তখন তাঁহার বাসা ছিল বৌবাজারের মলঙ্গা লেনে। স্যার আশুতোষ এই মলঙ্গা লেনেই জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক ষাট বছর আগে মলঙ্গা লেনে এই ক্ষুদ্র শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তখন কেহ জানিত না, যে, বিধাতা পুরুষ এই শিশুর ভিতরে সকল রকম শ্রেষ্ঠত্বের বীজ স্থাপন করিয়াছেন। গঙ্গাপ্রসাদও বুঝিতে পারেন নাই, যে, একদিন তাঁহার এই শিশুপুত্র "রয়েল বেঙ্গল টাইগার" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার ছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরীব দুঃখী রোগীদের মা-বাপও ছিলেন। কেননা —তিনি চিকিৎসা করিতে যাইয়া বহু গরীবদুঃখীর নিকট দর্শনী (ভিজিট) তো নিতেনই না—বেশির ভাগ তাহাদিগকে নিজের খরচে ঔষধ দিতেন—পথ্যও দিতেন। এমন স্নেহ মমতাপূর্ণ কোমল হৃদয় কম লোকেরই থাকে। পরের পৃষ্ঠার ছবিখানা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ কেমন একটা মানুষের মত মানুষ ছিলেন।

এই তো গেল বাবার কথা। এখন আশুতোষের মাতার কথাও একটু শুনিয়া লও। হাইকোর্টের জজীয়তি লইবার কালে আশুতোষের মা তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন, সে সংবাদ
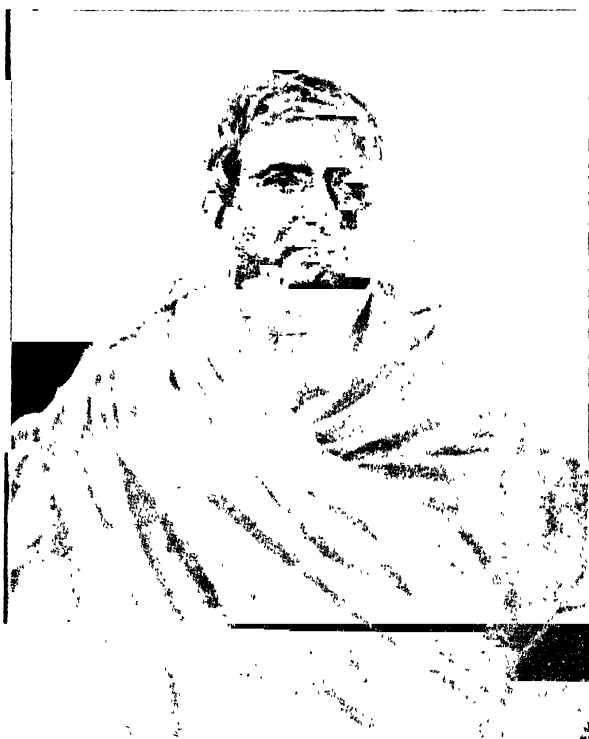
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ

তোমরা আষাঢ় মাসের (১৩৩১) শিশুসাথীতে পড়িয়াছ। তাহাতেই বুঝিয়াছ যে, তিনি স্বাধীনতাটা কত ভালবাসিতেন—তেজস্বিতা তাঁর মধ্যে কত বেশি ছিল। মায়ের এই স্বাধীন ভাব ও তেজস্বিতা পুত্র আশুতোষ ষোল আনা দখল

করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আশুতোষ জীবনে কখনো কাহারো কাছে মাথা নোয়ান নাই; বরং 'বাঙ্গালার বাঘ' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

স্যার আশুতোষের তেজস্বিতার আর একটি পরিচয় লও। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড যখন বিলাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন, এদেশে তখন লর্ড কর্জ্জন বড়লাট। তিনি বড় জবরদস্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই অভিষেক উপলক্ষে স্যার আশুতোষকে নিমন্ত্রণ করিয়া, বিলাত পাঠাইবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু আশুতোষ—মায়ের আজ্ঞা পাইবেন না বলিয়া বড়লাটের কথার উত্তর দেন। লাটসাহেব তখন বেশ্ জোরের সহিত বলেন—*

"তোমার মাকে বলিবে, তাঁর ছেলেকে ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাট (বিলাত) যাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন।"

আশুতোষের জিহ্বাগ্রে ছিল সরস্বতী—হৃদয়ে ছিল দুর্জ্জয় সাহস, সুতরাং বড়লাটের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় আশুতোষের কণ্ঠে শুনা গেল— †

* (টেল্ ইওর মাদার দ্যাট্ দি ভাইস্রয়্ এণ্ড গবর্ণরজেনারেল অব্ ইণ্ডিয়া কম্যাণ্ডস্ হার সন্ টু গো)।

† (দেন্ আই উইল টেল দি ভাইসরয়্ এণ্ড গবর্ণরজেনারেল অব ইণ্ডিয়া দ্যাট আশুতোষ মুখার্জি রিফিউজেস্ টু বি কম্যাণ্ডেড্ বাই এনি পার্সনস্ এক্সেপ্ট্ হিজ্ মাদার, বি হি দি ভাইস্রয়্ অর বি হি সাম্বডি হায়ার ষ্টিল্)।

"তবে আমিও ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাটকে বলি যে—আশুতোষ মুখার্জ্জি তা'র মা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির হুকুমে চলিতে অস্বীকার করে—তিনি রাজপ্রতিনিধি বা তাঁর চেয়েও উচ্চপদস্থ যে কেহই হউক না কেন।"

তোমরা বুঝিয়া লও আশুতোষ কতদূর মাতৃভক্ত আর কিরূপ স্বাধীনতাপ্রিয় দুর্জ্জয় সাহসী ছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে লর্ড কার্জ্জনই আশুতোষকে হাইকোর্টের জজ হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। যে মায়ের বুকের রক্তে আশুতোষ এমনি জগজ্জয়িনী শক্তি পাইয়াছিলেন—আশুতোষের জননী—সেই জগত্তারিণী দেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া তোমরাও ধন্য হইয়া লও।

আশুতোষ কিরূপ স্বাধীন লোক ছিলেন—তাঁর হাতে গড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি কিরূপ স্বাধীন দেখিতে চাহিতেন—দু' বছর আগে যখন বাঙ্গালা সরকারের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্য লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—আর সরকার হইতে টাকা দিয়া হাত পা বাঁধিয়া দিবার উদ্যোগ হয়, আশুতোষ তখন বজ্রকণ্ঠে বলিলেন— *

* (ইউ গিভ্‌ মি সেভারি উইদ্ ওয়ান্ হ্যাণ্ড্, এণ্ড্ মানি উইথ্ দি অ'দার্। আই ডিস্পাইজ্ দি অফার্। আই উইল্ নট্ টেক্ দি মানি। উই শেল্ রিট্রেঞ্চ্ এণ্ড্ উই শেল্ লিভ্ উইদিন্ আওয়ার্ মিন্স্। উই উইল গো ফ্রম্ ডোর্ টু ডোর্ অল্ থ্রু আউট্ বেঙ্গল্। আই উইল্ আস্ক্ মাই পোষ্ট গ্রাজুয়েট্ টিচার্স্ টু ষ্টারভ্ দেয়ার্ ফেমিলেজ্, বাট্ টু কিপ্ দেয়ার্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্...আই টেল্ ইউ এজ্ মেম্বারস্ অব দিছ্ ইউনিভার্সিটি, ষ্ট্যাণ্ড্ আপ্ ফর দি রাইট্স্ অব্

"তুমি আমায় এক হাতে দাসত্ব ও অপর হাতে অর্থ দিতেছ; আমি তোমার এ প্রস্তাবে ঘৃণা করি। আমি অর্থ

জগত্তারিণী দেবী

দি ইউনিভারসিটি। ফরগেট্ দি গভর্ণমেণ্ট অব্ বেঙ্গল্। ফরগেট্ দি গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া। ডু ইয়োর ডিউটি এজ্ সিনেটরস্ অব দিছ্ ইউনিভারসিটি। ফ্রিডম্ ফার্ষ্ট, ফ্রিডম্ সেকেণ্ড, ফ্রিডম্ অলওয়েজ্)।

লইব না—আমরা ব্যয় সংক্ষেপ করিব এবং আমাদের যাহা আছে আমরা তাহাতেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিব। আমরা উপবাস করিব—সারা বাঙ্গলার দুয়ারে দুয়ারে যাইব। আমি আমার পোষ্টগ্রাজুয়েট্ অধ্যাপকদিগকে বলিব, তাহারা যেন সপরিবারে উপবাস করিয়াও স্বাধীনতা রক্ষা করেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেম্বররূপে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, ইহার অধিকার রক্ষার জন্য আপনারা দণ্ডায়মান হউন; বাঙ্গলা সরকারের কথা ভুলিয়া যান, ভারত সরকারের কথা ভুলিয়া যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে ইহার কর্ত্তব্য পালন করুন। আদিতে স্বাধীনতা, মধ্যে স্বাধীনতা, সর্ব্বত্রই স্বাধীনতা!”

মানুষ যদি নিজকে বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে সে কোনদিনই বড় হইতে পারে না। সন্দেহই মানুষের সর্ব্বনেশে শত্রু। স্যার আশুতোষ কিন্তু এই শত্রুকে জয় করিয়াছিলেন। ‘পারিব না’ ও ‘ভয়’ কথাটা তাঁহার অভিধানে ছিলই না। ইহার ফলে, যখন যত কাজ উপস্থিত হইয়াছে - তাহা যত বড় শক্ত বা বাধা-বিঘ্নসঙ্কুল হোক না কেন—আশুতোষের অসাধারণ শক্তির কাছে পড়িয়া সেই কাজ রেঁদার মুখে কাঠ যেমন সমতল বা সোজা হইয়া যায়, তেমনি সরল হইয়া পড়িয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার সময়ই—আশুতোষ জোর করিয়া বলিতেন—“আমি হাইকোর্টের জজ হইব।” এজন্য

অনেকে তাঁহাকে অহঙ্কারী বলিতেন। যথার্থ ক্ষমতাশালীরাই কাজ করিবার জন্য জোর প্রকাশ করে, আর যাহাদের ক্ষমতা নাই, তাহারাই উহার নাম দেয় অহঙ্কার—দেমাক – গর্ব্ব— আরো কত কি। আশুতোষের হৃদয়ে অসাধারণ বল ছিল— কর্ম্মে অসাধারণ আসক্তি ছিল, সুতরাং তিনি যাহা বলিতেন —যাহা ভাবিতেন – তাহাই শেষ করিতেন।

জাতীয় পোষাক ও মাতৃভাষার উপর স্যার আশুতোষের অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। তিনি সরকারী কাজের সময় ছাড়া কখনো বিদেশী পোষাক পরিতেন না। বাঙ্গালীর পোষাকের ইজ্জৎ তিনি কি ভাবে রাখিয়াছিলেন, তাহার একটা ঘটনা শুনিয়া রাখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটা তদন্ত কমিটী বসে, উহার নাম হয় স্যাড্‌লার কমিশন। আশুতোষ উহার সদস্য ছিল।

এই কমিশন উপলক্ষে তিনি মহীশূরে যান। মহীশূরের মহারাজ তখন আশুতোষের সম্মানের জন্য একটা ইভিনিং পার্টি বা সান্ধ্যসম্মিলনের আয়োজন করেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌-কালে আশুতোষ ধুতিচাদর পরিয়া সম্মিলনে যাইতেছিলেন। পথেই রাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী একটি নূতন পাগড়ী দিয়া স্যার আশুতোষকে বলিলেন যে—এখানকার রাজদরবারে খালি মাথায় যাইবার নিয়ম নাই; আপনি এই পাগড়ী পরিয়া দরবারে ঢুকিয়াই যেন ওটা খুলিয়া ফেলেন, তাহা হইলেই হইবে। বাঙ্গালার শার্দ্দূল ইহা শুনিয়াই বাসায় ফিরি
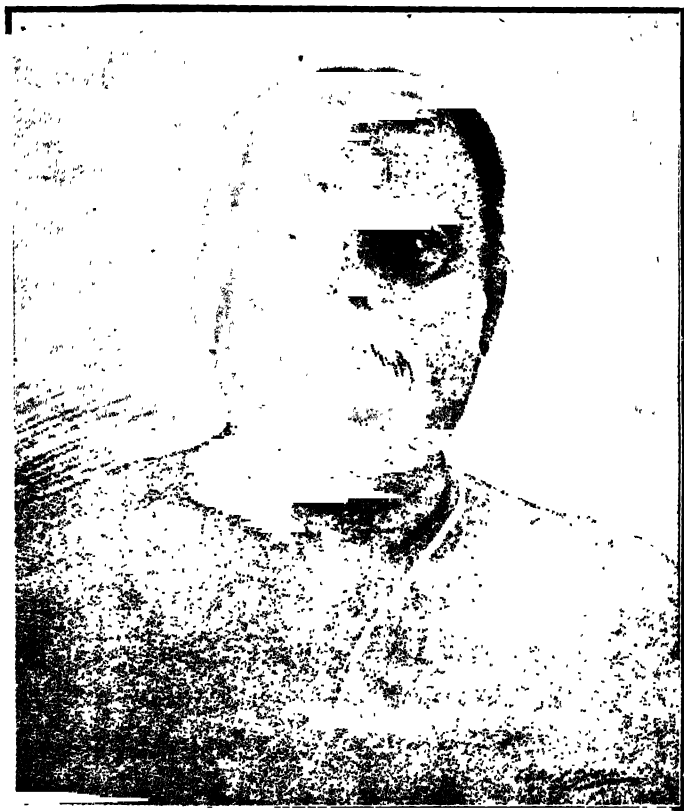
গেলেন—সম্মিলনে গেলেন না। সম্মিলনে আশুতোষকে না দেখিয়া মহারাজ তাঁহার সন্ধান করিলেন। শেষে প্রকৃত ব্যাপার জানিয়া প্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে যা ধম্‌কানী দিলেন, তাহা তো বুঝিতেই পার! মহারাজ তৎক্ষণাৎ যুবরাজকে

পাঠাইয়া আশুতোষকে সম্মিলনে আনাইলেন। সকলেই দেখিয়া জানিল—ইনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—আর তাঁর পোষাক দেখিয়া বুঝিল ইনি বাঙ্গালী!

তাঁর নিজের বাড়ীতে তিনি অন্যকে তো দূরের কথা, লাট সাহেবকেও খালি গায়ে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিয়াছেন। লাট সাহেবের বাড়ীতেও তিনি ধুতি চাদর পরিয়া যাইতেন। যে ব্যবহারে ও পোষাকে বাঙ্গালীর জাতীয়তা রক্ষা পায়, তিনি কিছুতেই তাহা ছাড়িতেন না; বরং তিনি যে বাঙ্গালী, সব ব্যাপারে তাহার পরিচয় দিতেন। চিত্তের এই সকল দৃঢ়-তার জন্য সর্ব্বত্রই তিনি আদর পাইতেন—সম্মান পাইতেন।

তারপর মাতৃভাষার কথা। তিনিই বাঙ্গালাভাষাকে বর্ত্তমান সভ্যজাতিগণের ভাষায় সহিত এক পংক্তিতে বসাইয়া গিয়াছেন—তা'র অস্পৃশ্যতা-দোষ দূর করিয়াছেন। বাঙ্গালা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা এম্-এতে পাঠ্য। বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া যদি শিক্ষার ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে ২।৫ বছরের মধ্যেই বাঙ্গালা দেশের কেবল পুরুষ নহে—লক্ষ লক্ষ মেয়েও বি-এ, এম্-এ ডিক্রী পাইত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আশুতোষ দেশের লোকের 'অশিক্ষিত' অপবাদ দূর করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন।

তোমরা আশুতোষকে আদর্শ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পা ফেলিলে অবশ্যই মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবে।

দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন

ভারতবর্ষে ত্রিশকোটী লোকের বাস—বাঙ্গালায়ও সাড়ে চারিকোটি লোকের বাস। ইহার মধ্যে একটীমাত্র মানুষ 'দেশ-বন্ধু' উপাধি পাইয়াছিলেন। ধনে মানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বড় বহু লোক আছেন—তাঁহাদের অনেকে অনেক প্রকার উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই 'দেশ-বন্ধু' হইতে পারেন নাই। শুধু চিত্তরঞ্জনই এই উপাধির একমাত্র মালিক হইয়াছিলেন। মহাকবী কালিদাস তাঁহার প্রণীত রঘুবংশ নামক মহাকাব্যের একস্থানে দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে বলাইয়াছেন—

হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো

মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ।

তথা বিদুর্মাং মুনয়ো শতক্রতুং

"পুরুষোত্তম বলিলে একমাত্র হরিকেই বুঝায়, ত্র্যম্বক বলিলে কেবল মহেশ্বরকেই বুঝায়, শতক্রতু বলিলেও তেমন একমাত্র ইন্দ্রকেই বুঝায়।"

আমাদের দেশেও সেইরূপ "বিদ্যাসাগর" বলিলে ঈশ্বর-চন্দ্রকে আর "দেশবন্ধু" বলিলে চিত্তরঞ্জনকেই শুধু বুঝায়।

এরূপ একনামা লোক এদেশে জন্মায় নাই। কি করিলে এইরূপ একনামা পুরুষ হওয়া যায়, চিত্তরঞ্জনের জীবন-কাহিনীই তাহার সাক্ষ্য দিবে। আজ তোমাদিগকে সংক্ষেপে সেই কাহিনী শুনাইব।
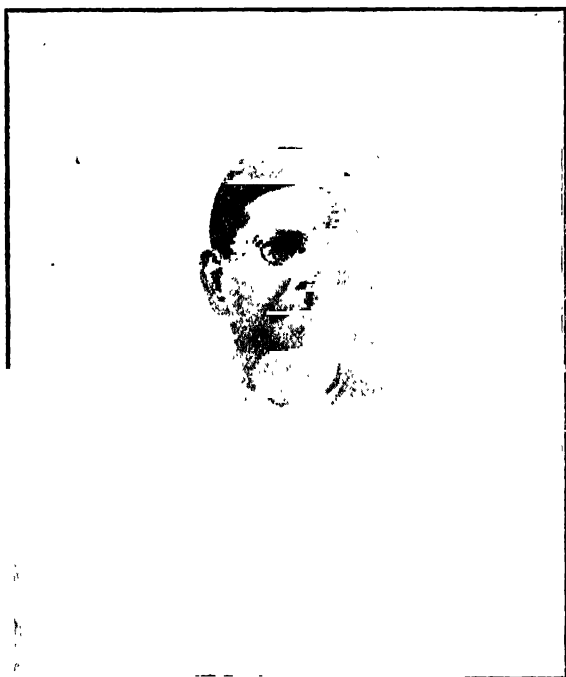
চিত্তরঞ্জনের পৈতৃক বাসস্থান তেলিরবাগ; ইহা ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায় অবস্থিত। পিতা ভুবনমোহন

দাস ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি, দুই জ্যেঠা-মহাশয় কালীমোহন ও দুর্গামোহন ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল।

বাঙ্গালা ১২২৭ সালের ৫ই কার্ত্তিক শনিবার প্রাতঃকালে—ঠিক বারবেলার ভিতরে চিত্তরঞ্জন ভূমিষ্ঠ হন। ভবানীপুরের লণ্ডনমিশনারী কলেজ হইতে চিত্তরঞ্জন ১৬ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় তিনি 'অনার' পাশ করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায়ই চিত্তরঞ্জনের পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, গাম্ভীর্য্য এবং নেতৃত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল।

বি-এ পাশ করিয়া চিত্তরঞ্জন আই, সি, এস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২০ বছর মাত্র। বিলাতের স্বাধীন আব-হাওয়ায় চিত্তরঞ্জনের হৃদয়েও অপূর্ব্ব স্বাধীনতার জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া উঠিল। শিশু-বয়স হইতে তাঁহার হৃদয়ে যে ন্যায় ও সত্যের আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—দিন দিন তাহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল।

এই সময়ে পার্শিকুলপ্রদীপ দাদাভাই নৌরোজী পার্লে-মেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। যুবক চিত্তরঞ্জন, নৌরোজীর পক্ষ লইয়া বিলাতের নানা স্থানে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। শ্রোতারা এই সু-দর্শন যুবকের অপূর্ব্ব ভাষা ও যুক্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিল। সকলেই

বুঝিল যে, বয়সে নবীন হইলেও এ যুবক জ্ঞানে প্রবীণ—পুরুষ-সিংহ বটে।

কিছুকাল পরে জন্ ম্যাক্লিন নামে জনৈক সাহেব হিন্দু ও মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্যায় কটূক্তি করিয়া এক বক্তৃতা দেন। চিত্তরঞ্জন সেই বক্তৃতা শুনিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন—জাতির অবমান সহিতে না পারিয়া বিলাতে যে সকল ভারতবাসী ছাত্র ছিল, তাহাদিগকে লইয়া দৃঢ়তার সহিত ম্যাক্লিনের উক্তির প্রতিবাদ করিলেন—তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। জন ম্যাক্লিন ছিলেন পার্লেমেণ্টের সভ্য; তাহা হইলেও যুবক চিত্তরঞ্জনের দৃঢ় প্রতিবাদের কাছে তাহাকে মাথা গুঁজিতে হইল—ক্ষমা চাহিতে হইল। শেষে পার্লেমেণ্টের সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব রক্ষায় চিত্তরঞ্জনের চিত্ত কতদূর উৎসুক ছিল, এই ঘটনায়ই তাঁহার প্রথম ও অত্যুত্তম প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

দেশের দুঃখ-দৈন্যের কথা যৌবনেই চিত্তরঞ্জনের চিত্তক্ষেত্র দখল করিয়াছিল। সুতরাং সুযোগ পাইলেই তিনি সে সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ করিতেন। জন ম্যাক্লিনের ব্যাপারের কিছুদিন পরে চিত্তরঞ্জন 'ভারতের সমস্যা' সম্বন্ধে আবার একটা বক্তৃতা করিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করিলেন বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান মন্ত্রী মহামতি গ্ল্যাড্ষ্টোন।

সেই বক্তৃতা শুনিয়া বিলাতের কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। আই, সি, এস্ পরীক্ষায় চিত্তরঞ্জন অষ্টম স্থানীয় হইলেন বটে, কিন্তু সরকারী চাকুরী পাইলেন না। কাজেই ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন। দেশের স্বার্থের জন্য সত্য কথা বলিয়া স্বস্তিবাচনেই তিনি সরকারী চাকরী, সম্মান প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিলেন। এই সময়ে চিত্তরঞ্জনের বয়স তেইশ বছর মাত্র।

পিতা ভুবনমোহন যৌবনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা ছিল না। দানে তিনি একেবারেই মুক্তহস্ত ছিলেন। সুতরাং দেনার দায়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া তাঁহাকে হাইকোর্টে দেউলিয়া নাম লিখাইতে হয়। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার সেই বিপুল ঋণভার গ্রহণ করিয়া স্বয়ংও দেউলিয়া নাম লইলেন। ইহার পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন। আইন অনুসারে ঋণের দায় হইতে মুক্ত থাকিলেও দেউলিয়া হইবার প্রায় ১৭।১৮ বছর পরে চিত্তরঞ্জন পিতার ঋণ প্রায় লক্ষ টাকা শোধ করিয়া দিলেন। যেদিন তিনি এই টাকা শোধ করেন, সেইদিন হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি ফ্লেচার সাহেব বলিয়াছিলেন—"দেউলিয়া হইয়াও কোন ব্যক্তি সমস্ত ঋণ শোধ করে, এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আমি এই প্রথম দেখিলাম।" ন্যায়ের প্রতি চিত্তরঞ্জন কত অনুরাগী ছিলেন, ইহা তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

পিতার দাতৃত্বগুণ পুত্র চিত্তরঞ্জনে পূর্ণমাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল। তাঁহার দান পায় নাই দেশে এমন অনুষ্ঠান খুব কমই আছে। পুরুলিয়ার অনাথ আশ্রমে দেশবন্ধুর দান ছিল মাসিক দুই হাজার টাকা; ইহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া নদীয়ার নিত্যানন্দ আশ্রমের সহিত মিলাইবার কালে চিত্তরঞ্জন এককালীন দুই লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষে, উত্তরবঙ্গের জলপ্লাবনে—তিনি মুক্ত হস্তে টাকা দিয়াছিলেন। কলেজের ছাত্র ও গ্রন্থকার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক কোন ব্যাপারের জন্য যে কেহ তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিত, সে-ই আশার অতীত প্রচুর দান পাইত। অর্থোপার্জ্জনের উপায় ছাড়িবার পর দেশবন্ধু তাঁহার সর্ব্বস্ব রসারোডের বাড়ীটি জনহিতকর কার্য্যের জন্য দান করিয়া আশ্রয়হীন হইয়াছিলেন। এভাবে দেশের জন্য ভিখারী সাজিয়া সর্ব্বস্ব দান এপর্য্যন্ত আর কেহ করেন নাই।

বঙ্গ-ভঙ্গের পর দেশে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয়—উহার ফলে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হয়। এই আন্দোলনে চিত্তরঞ্জনও যোগ দিয়াছিলেন। তারপর বহু স্বদেশ-সেবক যুবকের বিরুদ্ধে সরকার হইতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়—স্বদেশ-প্রাণ চিত্তরঞ্জন এই মোকদ্দমায় আসামীপক্ষে দাঁড়ান এবং আইনের বলে অরবিন্দ ঘোষ ও আর কয়েকজন আসামীকে খালাস করিয়া বিজয়ী বীরের মতন দেশবাসীর কাছে শ্রদ্ধা লাভ করেন। ইহার পর তিনি বহু স্বদেশী মোকদ্দমায়

আসামী পক্ষে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এ সকল মোকদ্দমায় তিনি নামমাত্র ফিস্ লইতেন, অথচ আসামীরা ফল পাইত অসাধারণ। দেশের ও দেশবাসীর প্রতি অসাধারণ মমতাই চিত্তরঞ্জনকে এই সকল মামলায় টানিয়া আনিয়াছিল।

এরপর মহাত্মা গান্ধী যখন অসহযোগ-নীতি প্রচার করিলেন—তখন দেশপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দেশের কল্যাণ-কামনায় সেই নীতি মাথা পাতিয়া লইলেন। দৈনিক কমপক্ষে তাঁহার আয় হইত হাজার টাকা ;—তিনি স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় স্বজন কাহারো বিষয় মনে স্থান না দিয়া—তাঁহার একমাত্র আয়ের পথ ব্যারিষ্টারী এক নিমিষে ছাড়িয়া দিলেন! স্বার্থ ও ভোগসুখের কাছে দেশপ্রেম জয়লাভ করিল!

রাজনীতিক্ষেত্রে নামিবার পরই চাঁদপুরের কুলিবিভ্রাট উপস্থিত হয়। চিত্তরঞ্জন সে সংবাদ শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারেন নাই, অমনি সস্ত্রীক চাঁদপুরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তখন আবার শ্রমিকের দল ধর্ম্মঘট করায় গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত ষ্টীমার চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। দুর্জ্জয় সাহসী—অকপটকর্ম্মী সে বাধায় ভয় পাইলেন না—ভয়ঙ্করী পদ্মার প্রবল স্রোত বা ভীষণ তরঙ্গ তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দিতে পারিল না। চিত্তরঞ্জন সামান্য একখানা ডিঙ্গি নৌকায় চড়িয়া সস্ত্রীক চাঁদপুর চলিয়া গেলেন। আপন প্রাণ—সহধর্ম্মিণীর প্রাণও তাঁহার কর্ত্তব্যের

কাছে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল। এই গুণেই তিনি দেশবন্ধু—এই গুণেই তিনি চিত্ত-রঞ্জন।

দেশের বন্ধু চিত্তরঞ্জন স্ত্রী-পুত্র কন্যা ভগিনী প্রভৃতি লইয়া দেশের কল্যাণে মাতিলেন। ফলে পুত্র চিররঞ্জন ছয়মাসের জন্য কারাভোগ করিলেন,—পত্নী বাসন্তী দেবী ও ভগিনী উর্ম্মিলা দেবীও পুলিশকর্ত্তৃক ধৃতা হইলেন;—শেষে ১৯২১ খৃঃ অব্দের ১০ই ডিসেম্বর স্বয়ং ধৃত হইয়া ছয় মাসের জন্য কারাগারে গেলেন। একদিন যিনি আইনের জোরে কত আসামীকে খালাস করিয়া আনিয়াছিলেন, আজ অসহযোগী হইয়া স্বয়ং আসামী হইলেও তিনি সরকারী আইনের সাহায্য লইলেন না। চিত্তরঞ্জনের একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা কতদূর ছিল, ইহাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা সফল করিতে প্রাণপণ করিতেন,—কোন বাধাই তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে ফিরাইতে পারিত না। এইভাবে দেশের সেবা করার ফলেই তিনি দেশবাসীর কাছে উপাধি পাইলেন "দেশবন্ধু"।

কারাগার হইতে বাহির হইয়াই তিনি আবার দেশের কর্ম্মে মাতিলেন। দেশের ও দেশবাসীর কিসে মঙ্গল হইবে, তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল। রাজার মত ভোগসুখে যাঁহার দিন যাইতেছিল, পদাঘাতে সেই ভোগসুখ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া ভোগী চিত্তরঞ্জন যোগী হইলেন—খদ্দর পরিলেন—শাকান্নে দিন কাটাইয়া—উল্কা যেমন আকাশের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিমেষে গমন করে, তেমনি ভারতবর্ষময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অদম্য চেষ্টায় স্বরাজ্য দল গঠিত হইল, তাঁহারা সরকারী কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া বারংবার সরকারকে পরাস্ত করিলেন। বাঙ্গালার গভর্ণরের ক্ষমতা অব্যাহত থাকিলেও চিত্তরঞ্জন এমনভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন যে—গভর্ণমেণ্টকে পরাজয় স্বীকার করিয়া ইস্তাহার জারি করিতে হইল। নিঃস্বার্থপরতার—অকপট দেশ-সেবার—জয়জয়কার হইল। দেশের ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ সকলের মুখে দেশবন্ধুর নাম মন্ত্র জপের মত উচ্চারিত হইতে লাগিল।

অপরিমিত পরিশ্রমে শীঘ্রই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল—দেহে ব্যাধি আশ্রয় লইল। তবু ত দেশের জন্য তাঁহার ভাবনার বিরাম নাই, খাটুনির অন্ত নাই! কিন্তু দেহ ত তাহা মানিয়া লইতে পারিল না—ক্রমে সে অচল হইয়া আসিল। শেষে চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি শরীর শোধরাইবার জন্য দার্জ্জিলিং গেলেন। দীপের শেষ তৈল-বিন্দুটি পুড়িবার সময় যেমন দীপের শিখা বেশ্ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তেমনি দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য দার্জ্জিলিং যাইয়া একটু ভাল হইল। তারপর ২রা আষাঢ় সহসা কলিকাতায় সংবাদ আসিল দেশবন্ধু নাই—অপরাহ্ণ ৫টায় তাঁহার আত্মা অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে!

লক্ষ লক্ষ লোকের শবানুগমন

বিদ্যুদ্‌বেগে এই নিদারুণ সংবাদ সহরময় ছড়াইয়া পড়িল,—যে শুনিল সে-ই প্রথমে অবাক্ হইয়া রহিল,

তারপরে হায় হায় করিয়া উঠিল! রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত লোকজন চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া, টেলিগ্রাম পাঠাইয়া, টেলিফোনে কথা বলিয়া—সংবাদ ঠিক কি না জানিতে চাহিল। পরদিন বুধবার বিশাল কলিকাতার দোকান বাজার প্রভৃতি আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল—বিরাট সহরের উপর শোকের কালিমা ছড়াইয়া পড়িল। সর্ব্বত্র কেবল দেশবন্ধুর কথা লইয়া আলোচনা চলিল। এমন সময় সংবাদ আসিল, দেশবন্ধুর দেহ কলিকাতায় আনিয়া দাহ করা হইবে। লোকেরা তখন দেশবন্ধুর মৃত-দেহটিও শেষ দেখা দেখিবে বলিয়া উৎকণ্ঠায় রাত্রি কাটাইল।

বৃহস্পতিবার ভোরে দার্জ্জিলিং মেল গাড়ীতে দেশবন্ধুর মৃতদেহ কলিকাতায় আসিল। সুদীর্ঘ এক মাইলব্যাপী বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া মৃতদেহ কালীঘাটের শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহ করা হইল। এই শোভাযাত্রায় অন্যূন চারি লক্ষ লোক যোগদান করিয়াছিল। এতবড় বিরাট শোভাযাত্রা পৃথিবীতে খুব কমই দেখা গিয়াছে। দেশের লোকেরা দেশবন্ধুকে কি চক্ষে দেখিত—কেমন ভালবাসিত—কত আপনার মনে করিত, —শোভা যাত্রার আলোক-চিত্র দেখিলেই সকলে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।

দেশবন্ধুকে হারাইয়া বাঙ্গালী শোকে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাহারা মর্য্যাদা-বুদ্ধি ছাড়িয়া সকল জাতীয় লোকে পরস্পরের গলা ধরিয়া দেশবন্ধুর

দেশবন্ধুর ধুলময় শবদেহ

শবের সহিত শ্মশানে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। শিয়ালদহের বিশাল ষ্টেশন, নিকটবর্ত্তী সার্কুলার রোড্ ও হ্যারিসন রোডের বহুদূর পর্য্যন্ত এত লোক একত্র হইয়াছিল যে, একটি সূঁচ রাখিবার ফাঁকও তাহাতে ছিল না। রাস্তা, দালানের বারান্দা, ছাদ, কার্নিস, গাছ, ট্রাম বা টেলিফোনের থামগুলিতে পর্য্যন্ত লোক সকল আশ্রয় লইয়া দেশবন্ধুকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীবভাবে অবস্থান করিতেছিল।

দেশবন্ধুর শব-দেহ গাড়ী হইতে নামান হইলে উপস্থিত লোক সকল দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার মত তাঁহার উপর ফুল, ফুলের মালা এবং ফুলের তোড়া প্রদান করিয়া হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছিল। ছবিতে দেখ, দেশবন্ধুর মুখখানা ছাড়া দেহের আর সকল অংশ ফুলের একটা স্তূপ বলিয়া মনে হইবে। দেশবন্ধু, দেশের জন্য যেমন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমনি সকলের কাছে অনুরূপ পূজা পাইলেন। পরার্থ-পর না হইতে পারিলে কেহই পরের কাছে সম্মান পায় না।

কালীঘাটের শ্মশানে আন্তরিক-হিন্দু চিত্তরঞ্জনের দেহ হিন্দু আচার অনুযায়ী বার মণ চন্দন কাষ্ঠ ও এক মণ ঘৃত সহযোগে দাহ করা হইয়াছিল। অসংখ্য নরনারী পুণ্যময় তীর্থক্ষেত্রবোধে সেই দাহ-স্থানে উপস্থিত ছিল।

দেশবন্ধুর শবদাহ

দেশবন্ধুর শত শত উক্তি হইতে কয়েকটি কথার অংশমাত্র তোমাদিগকে শুনাইতেছি—

(১) "এই কাজ করিতে করিতে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি আবার এই পৃথিবীতে—এই বাঙ্গালা দেশেই—জন্ম গ্রহণ করিব আবার আমার দেশের জন্য কাজ করিব—আবার চলিয়া যাইব, আবার আসিব। এইরূপে যতদিন না আমার মনের আশা সম্পূর্ণ হইবে - আদর্শের পূর্ণ পরিণতি ঘটিবে, ততদিন এই ভাবেই এখানে কাজ করিতে আসিব।"

(২) "দেশ বলিলে আমি ইষ্টদেবতাকেই বুঝি।"

(৩) "ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এদেশে বাস করিয়া গিয়াছেন, এখন আমরা বাস করিতেছি। এ দেশের ধূলিকণাও আমাদের কাছে পবিত্র।"

(৪) "আমি চাই সমষ্টির কল্যাণ—সমগ্র দেশবাসীর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা। আমার কি হইবে তাহা আমি জানিতে চাহি না; বর্ত্তমান বাঙ্গালীর কি হইবে তাহাও জানিবার প্রয়োজন নাই; আজিকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহাও ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু চাই আমার জাতির কি হইবে।"

(৫) "যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোরে,
যেমন করেই হোক যেতে হবে মোরে।
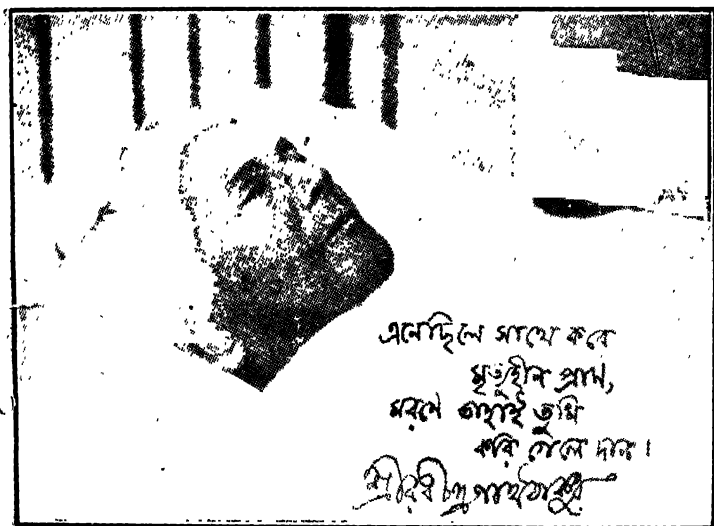
পথখানি যেথা থাক্ পাব আমি পাব,
যেমন করেই হোক যাব আমি যাব।”

চিত্তরঞ্জন তাহার এই সকল কথা প্রাণদিয়া রক্ষা করিয়া গিয়াছেন—তাই তিনি দেশবাসীর চিত্তের রঞ্জন—দেশ-বন্ধু।

দেশবাসীর প্রতি—দেশের প্রতি—দেশবন্ধুর যেরূপ অগাধ ভালবাসা ছিল, এমন আর কাহারো ছিল না। আরো, তাঁহার ভালবাসা শুধু কথায় ছিল না, তাঁহার কথা ও কাজ এক ছিল। তোমরাও দেশবাসীকে—দেশকে—দেশবন্ধুর মতই অকপটে ভালবাসিতে শিক্ষা করিও।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ১২৫৫ সনের কার্ত্তিকমাসে (ইংরেজী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে) সুরেন্দ্রনাথ, কলিকাতা সহরের তালতলা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সর্ব্বজন-পরিচিত ডাক্তার ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ পিতার দ্বিতীয় পুত্র।

হাতে-খড়ির পর সুরেন্দ্রনাথ পটলডাঙ্গা অঞ্চলের এক পাঠশালায় পড়িতে যান; - কিন্তু গুরুমহাশয় তাহাকে একদিন এমন একটা সম্বোধন করিয়াছিলেন যাহাতে শিশুর মনে জাতীয় গৌরবের বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। ফলে সে পাঠশালা তিনি সেদিনই ছাড়িয়া দেন। শেষে বছর দুই বাঙ্গালা শিক্ষার পর তিনি ডভেটন ইন্‌ষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হন এবং পনর বছর বয়সে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এল্‌-এ পরীক্ষায় তিনি সিনিয়র বৃত্তি পাইয়া উত্তীর্ণ হন এবং ২০ বছর বয়সে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ জে, সাইম সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভায় এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি ডাক্তার

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যে, সুরেন্দ্রনাথকে সিভিল সার্ভিস্ পড়িবার জন্য বিলাত পাঠান হউক। তদনুসারে রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়দ্বয়ের সহিত এক সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ—১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ৩রা মার্চ্চ বিলাত গমন করেন।

আই, সি, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও বয়সের গোলযোগের কথা তুলিয়া পরীক্ষার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার নাম তুলিয়া দিতে উদ্যত হন; তেজস্বী যুবক তখন পরীক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। ব্যাপারটা সুবিধাজনক হইবে না দেখিয়া, কর্ত্তারা শেষে সুরেন্দ্রনাথকে পাশ করিয়া দেন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে রমেশচন্দ্র ৩য়, বিহারীলাল ১৪শ, সুরেন্দ্রনাথ ৩৪শ ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর ৩৯শ স্থান অধিকার করেন। এই বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল তিনশতেরও বেশি; তন্মধ্যে ভারতীয় চারিজন মাত্র।

সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে থাকিতে থাকিতেই ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে সুরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীহট্টের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু দুই বছর কাজ করিবার পরই তাঁহার চাকরী যায়। তিনি চাকরী পাইবার জন্য বিলাত পর্য্যন্ত যাইয়া আপীল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই।

কথায় আছে "ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্যই," সুরেন্দ্রনাথের চাকরী যাওয়াতেও তাহাই ফল হইল। প্রথমে তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে অধ্যাপক হইলেন, কিছুকাল পরে সেখান হইতে ফ্রি-চার্চ্চে যান। পরে বৌবাজারে স্কুল স্থাপন করিয়া স্বয়ং অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ঐ স্কুল পরে রীপণ কলেজে পরিণত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে নামিয়া যাহাদিগকে ছাত্ররূপে পাইলেন, তাহারা দেশের ভাবী কর্ম্মকর্ত্তা—যুবকদল। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে একদিকে যেমন বিবিধ বিদ্যা-বিভূষিত করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাহাদিগের অন্তরে স্বজাতি ও স্বদেশপ্রীতি জাগাইয়া তুলিলেন। ভাবিকালে এই যুবকদলই তাহার নেতৃত্বে দেশের কাজে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি যখন যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতেই দেশের শিক্ষিতগণ তাঁহার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি কেবল দেশের শিক্ষাগুরু নহেন—তিনি স্বদেশপ্রীতির এবং রাজনীতির দীক্ষাগুরুও।

যাঁহাদের চেষ্টায় জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস) স্থাপিত হয়—তন্মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ একজন। তিনি পুণা ও আমেদাবাদ কংগ্রেসে সভাপতির গৌরবপূর্ণ পদ লাভ করেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স কমাইয়া ১৯ বৎসর করিবার প্রস্তাব হইলে, সংবাদ-পত্র-দমন আইনের প্রস্তাবে, ব্যবস্থাপকসভায়, মিউনিসিপ্যালিটীতে—সর্ব্বত্র সুরেন্দ্রনাথ তেজস্বিতার সহিত

নির্ভীকভাবে দেশের স্বার্থের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। সরকারী ব্যবস্থায় যখন বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথ দেশে এমন তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করেন যে, তেমন ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে আর ঘটে নাই। সরকারী আদেশ রহিত করিবার জন্যই দেশবাসী সুরেন্দ্রনাথের কথায় বিলাতী দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করে। বাঙ্গালার এই স্বদেশী ব্যাপার ক্রমে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে ব্যাপার এমন দাঁড়ায় যে, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ স্বয়ং এদেশে আসিয়া ১৯১১খৃঃ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিয়া দেন।

নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে সুরেন্দ্রনাথ স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল আইন নূতনভাবে প্রবর্ত্তন করেন—তাহারই ফলে দেশীয় লোকেরা কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালক হইয়া সহরের বহু উপকার করিতেছেন।

চাকরী যাওয়ার ফলেই দেশবাসী সুরেন্দ্রনাথকে দেশ-সেবায় নেতৃস্থানে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। এইভাবে দেশের সেবা করিতে করিতে এই কর্ম্ম-বীর গত ১৩৩২ সনের ২১শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার বেলা ১৷৷ টার সময় পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

বয়সে প্রবীণ হইলেও সুরেন্দ্রনাথ নবীনের মত কর্ম্মপটুতা, উদ্যমশীলতা ও নির্ভীকতার সহিত শেষ জীবনের সমুদয় কাজ করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গ-গৌরব

তোমরা কংগ্রেসের নাম শুনিয়াছ। সোজা কথায় উহা প্রজাসাধারণের সভা। কি করিলে, কেমন করিলে, দেশের তাবৎ লোক সুখে স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে থাকিতে পারে, এই সভায় তাহাই নির্দ্ধারিত হয়। ভারতবর্ষের লোকেরা তাহাই মানিয়া লইয়া নির্দ্ধারণমত কাজ করিতে থাকে। সাধু ভাষায় ইহার নাম **"নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র-মহাসভা।"**

বয়সে, বিদ্যায় ও শক্তিতে যিনি শ্রেষ্ঠ, প্রতিসংসারে প্রায়ই তিনি হ'ন কর্ত্তা। এই রাষ্ট্র-মহাসভারও যিনি কর্ত্তা হ'ন, তাঁহাকেও সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ হওয়া চাই। এ বছর যিনি এই রাষ্ট্র-মহাসভায় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, তিনি একজন স্ত্রীলোক এবং বাঙ্গালী স্ত্রীলোক। বাঙ্গালার পক্ষে ইহা কতই না গৌরবের বিষয়!

এই বিদুষী বঙ্গ-বালার নাম **শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু।** সংক্ষেপে তোমাদিগকে তাঁহার পরিচয় দিব।

ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায় ব্রাহ্মণগাঁও নামে একটী

গ্রাম আছে। রামচরণ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামের একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তিনি ঢাকার আবগারী সেরেস্তায় কাজ করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র—অঘোরনাথ ও মথুরানাথ। অঘোরনাথ দেশে লেখাপড়া শেষ করিয়া বিলাতে যান। তথায় এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর অব্ সায়েন্স' উপাধি পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। দাক্ষিণাত্যের নিজামরাজ্যে তিনি জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি তথাকার কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অঘোরনাথ বিলাত হইতে দেশে ফিরিবার দুই বৎসর পরে ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে হায়দরাবাদ নগরে শ্রীযুক্তা সরোজিনীর জন্ম হয়। অঘোরনাথ নিজে যেমন অসাধারণ বিদ্বান্ ছিলেন, আপন ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষায়ও তেমনি অগ্রণী ছিলেন। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে সরোজিনী মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১২ বছর। তিনি শেষশিক্ষা লাভ করেন বিলাতে।

মান্দ্রাজের নাইডুবংশে বিবাহিতা হইয়াছেন বলিয়া সরোজিনীর উপাধি হইয়াছে নাইডু।

সরোজিনীদেবী একাধারে কবি ও রাজনীতিবিদ্। তাঁহার তেজস্বিতা, দৃঢ়তা এবং সাহসও অসাধারণ। তিনি বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তিসামর্থ্যে কত বড়,—ভারতের সকল দেশের লোক যে তাঁহাকেই রাষ্ট্র-মহাসভার কর্তৃত্ব দিয়াছেন,—এই এক ব্যাপারেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছ।

এবার এই রাষ্ট্র-মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল কানপুরে। চল্লিশ বছর যাবৎ ইহার সৃষ্টি। ইহাতে বারো বারের অধিবেশনেই সভাপতি নির্দ্ধারিত হইয়াছেন বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর ইহাও বিশেষ গৌরবের কথা যে, প্রথম কংগ্রেসে

যেমন বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লিউ. সি. বানার্জি) সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তেমনি বাঙ্গালার মেয়েই আবার কংগ্রেসে প্রথম ভারতীয় মেয়ে সভাপতির কাজ করিতে পাইলেন। শিক্ষা দিলে এবং শিক্ষা পাইলে মেয়েরাও যে, দেশের নেতৃত্ব করিতে পারে,

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী তাহারই বিশিষ্ট পরিচয়স্থল।

কানপুরে যখন রাষ্ট্র-মহাসভার অধিবেশন হইতেছিল, তখন কলিকাতায় "**নিখিল ভারত সমাজসংস্কার-সম্মেলনের**" অধিবেশন হইতেছিল। সেখানেও বাঙ্গালার গৌরব অটুট রহিয়াছে। সেই সম্মেলনে নেতৃত্ব করিয়াছেন শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বি. এ.। ইনি বিশ্ববিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাগিনেয়ী প্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীযুক্তা স্বর্ণ-কুমারী দেবীর কন্যা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হইতে বি. এ. উপাধি লাভ করিয়া ইনি বহুকাল সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা "ভারতী" সম্পাদন করিয়াছেন। উহাতে তাঁহার প্রভূত যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবীর ন্যায় ইনিও বাঙ্গালার বাহিরে—পঞ্জাবে বিবাহিতা হন। ইঁহার স্বামী স্বর্গীয় রামভুজ দত্ত চৌধুরী লাহোরের একজন নেতা ছিলেন।

বর্ত্তমান ১৩৩২ সনে বাঙ্গালার মেয়েরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্কারে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পরিচালনভার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর পক্ষে কতই না গৌরবের কথা।

লর্ড সিংহ

বাঙ্গালার মাটিতে জন্মিয়া যাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ১৩৩১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে গিয়াছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ১৩৩২ সনের আষাঢ়ে দেশবন্ধু, শ্রাবণে স্যার সুরেন্দ্রনাথ; আর আজ ১৩৩৪ সনের ফাল্গুনে গেলেন লর্ড সিংহ। চারি বছরের মধ্যে যে চারিজন মনীষী বাঙ্গালার বক্ষ শূন্য করিয়া গেলেন তাঁহারা তুলনার অতীত। এই চারিজনের অভাব কেবল বাঙ্গালা নহে—সমুদয় ভারতবর্ষ বহুকাল অনুভব করিবে।

পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে,—এমনি এক মার্চ্চ মাসের ২৪শে তারিখে, রায়পুরের প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশে সত্যেন্দ্র প্রসন্নের জন্ম হয়। রায়পুর বীরভূম জিলায় অবস্থিত। বীরভূম জিলা-স্কুল হইতে ১৪ বছর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই, এ, পাশ করেন। পর বছর তাঁহার বিবাহ হয় এবং ১৮ বছর বয়সে তিনি ও তাঁহার দাদা এন্, পি, সিংহ বিলাতে পড়িতে যান।

সত্যেন্দ্র প্রসন্ন চারি বছর আইন পড়িয়া বিশেষ

যোগ্যতার সহিত ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ২২ বছর। পর বছরই তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি আইনজ্ঞানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং চল্লিশ বছর বয়সে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলের পদ পান। তিন বছর যাইতে না যাইতেই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এড্‌ভোকেট্ জেনারেলের পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত করেন; তিন বছর কাজ করিবার পর তিনি ঐ পদে পাকা হ'ন। এই সময়ে তাঁহার বয়স তেতাল্লিশ বছর। সত্যেন্দ্র প্রসন্নের পূর্ব্বে কেবল কোনও বাঙ্গালী নহে—কোনও ভারতবাসীই এড্‌ভোকেট জেনারেলের গৌরবপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই।

তারপরে ভারতে নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে ১৯০৯ খৃঃ অব্দে তিনি ভারতীয় একজিকিউটিভ কাউন্সিলে আইন-সচিব হ'ন। ভারতীয়ের মধ্যে এ পদও তিনিই প্রথম পান। কিন্তু তিনি এই পদে বেশি দিন কাজ করেন নাই—বরং কাজ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তিনি কেবল সরকারী চাকরীই করিতেন না—স্বদেশের উন্নতির প্রতিও তাঁহার অসীম আকর্ষণ ছিল। তিনি কংগ্রেসের একজন বিশেষ সভ্য ছিলেন। ১৯১৫ খৃঃ অব্দের মান্দ্রাজ কংগ্রেসে তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন।

সেই বছরই তিনি সরকার হইতে নাইট্‌ উপাধি পান এবং পুনরায় বাঙ্গালার এড্‌ভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত হ'ন।

দুই বছর পরে তিনি সরকারী কাজে বিলাত যান। এই সময়ে তাঁহাকে বারংবার বিলাতে যাইতে হইয়াছিল। ১৯১৮

খৃঃ অব্দে তিনি কে, সি, উপাধি পান। এই বিষয়েও তিনিই ভারতবাসীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। পর বছর তিনি হ'ন—বিলাতে "সহকারী ভারত- সচিব।" এই সময়ে তিনি 'লর্ড' উপাধিও পান। এতবড় একটা পদ এবং উপাধি যে কোনও

ভারতবাসী পাইতে পারে—লোকে ইহার আগে তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

১৯২০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণর হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এক বছর কাজ করিবার পর তিনি অসুস্থ হইয়া এই পদ ত্যাগ করেন এবং কে, সি, এস্ আই, উপাধি পান। সুস্থ হইবার পর ১৯২৩ খৃঃ অব্দে তিনি বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলের জজ হইয়া তথায় গমন করেন।

অতি অল্প দিন পূর্ব্বেই তিনি ছুটি লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র অনারেবল সুশীলকুমার সিংহ বহরমপুরের জেলা-জজ। লর্ড সিংহ ৩রা মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় সস্ত্রীক তথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ৪ঠা মার্চ্চ তারিখ তিনি সুস্থ শরীরে বেড়াইয়াছেন, অপরাহ্ণে কাশিমবাজার-মহারাজের প্রাসাদে তিনি প্রীতি-সম্মিলনে যোগ দিয়াছিলেন। তারপর সন্ধ্যা ছয়টায় বাড়ী ফিরিয়া নিয়মিত আহারাদি করিয়া যথাসময়ে শয়ন করেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে আর শয্যাত্যাগ করেন না। তখন সিভিল সার্জ্জন আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া নিদ্রিতাবস্থায়ই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় এ সংবাদ আসিল। সকল সরকারী, বেসরকারী আফিস—আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। ই মার্চ্চ তারিখে প্রাতে তাঁহার দেহ

কলিকাতায় আনীত হয় এবং বিরাট মিছিল করিয়া তাহা ষ্টেসন হইতে নানা রাজপথ ঘূরিয়া তাঁহার ইলিসিয়াম্ রোডের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। পরে—"ক্রিমেটোরি-য়ামে" তাঁহার দেহের দাহকার্য্য শেষ হয়।

লর্ড সিংহ বাঙ্গালার—তথা ভারতবর্ষের বিরাট পুরুষ। তাঁহার সুমিষ্ট স্বভাব, নিরহঙ্কার ভাব ও অপরিসীম সাধুতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। চারি বছরে বাঙ্গালার—শুধু বাঙ্গালার নহে—ভারতবর্ষের—যে সর্ব্বনাশ হইল, চারি শতাব্দীতেও তাহা পূর্ণ হইবে কি না—কে জানে?

স্বদেশ-প্রাণতা

তোমরা জাপান দেশের নাম শুনিয়াছ। অনেকে কলিকাতায় জাপানী লোকও দেখিয়াছ। সেই হলুদ্-আভা রঙ্গের দেহ, ক্ষুদ্র-চক্ষু, চেপ্টা নাক, বেটে লোকগুলির উদ্যম উৎসাহ ও দেশের জন্য প্রাণপাতের বৃত্তান্ত শুনিলে তোমরা অবাক্ হইবে।

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম কোণে আটলান্টিক মহাসাগরে যেমন বৃটন সাম্রাজ্য, এশিয়ার পূর্ব্ব-উত্তর কোণে প্রশান্ত মহাসাগরে তেমনি জাপান। দুই-ই দ্বীপ, দুই-ই ক্ষুদ্র, অথচ দুই-ই পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সকল বিষয়ে সমান উন্নত। তাই জাপানের নাম "প্রাচ্য-বৃটন।"

রুষিয়া অতি প্রকাণ্ড রাজ্য। ইউরোপ ও এশিয়ার সমস্ত উত্তরভাগ জুড়িয় তাহার অধিকার। ইউরোপের অংশে তাহার রাজধানী। সেখান হইতে জাপানের পশ্চিম-দিকে—জাপানসাগরের তীর পর্য্যন্ত—তাহারা একটা বিশাল রেলপথ পাতিয়াছে! সেই রেলপথটার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ হাজার মাইল!! এখন বুঝিয়া দেখ রাজ্যটা কত বড়!

রুষিয়া যখন এই বিশাল রেলপথ তৈয়ারী করে, তখন অনেক জাপানী, চীনামজুরদের সঙ্গে মিশিয়া এই রেলপথে মজুরের কার্য্য করিতে লাগিল। রেলপথের সকল খুঁটিনাটি বেশ্ ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে লাগিল। এই সকল জাপানী কিন্তু যথার্থই মজুর ছিল না; ইহাদের মধ্যে জাপানের বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারও ছিল। শত্রুর ঘরের খবর জানিবার জন্য—স্বদেশের কল্যাণ কামনায়—ইঁহারা মজুরী করিতেও একটু মাত্র সঙ্কোচ করেন নাই!!

(১)

একজন জাপানীর নাম ফুফুসিমা। জর্ম্মনীর রাজধানী বার্লিনে ইনি অনেক দিন ছিলেন। জাপান কিরূপে শত্রু হইতে রক্ষা পাইবে—কি করিলে শত্রুদিগকে সহজে জব্দ করা যাইবে, ইনি সর্ব্বদা সে ভাবনা ভাবিতেন। বার্লিন হইতে দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে হইল যে, রুষিয়ার এই চারি হাজার মাইল লম্বা রেলপথটাই একদিন জাপানের মহাবিপদের কারণ হইবে। সুতরাং এই শত্রুটার ভিতর-বাহিরের সকল সংবাদ বিশেষভাবে জানিয়া লইতে হইবে।

ফুফুসিমা ইহা ভাবিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া দেশে যাত্রা করিলেন। দীর্ঘকাল এই রেলপথের পাশে পাশে চলিয়া—তিনি রেলপথটাকে বেশ ভালরূপে দেখিয়া লইলেন। পথটা কোথায় কিভাবে গিয়াছে, কোন্ স্থানে কোন্ নগর, গ্রাম,

হ্রদ, নদী পর্ব্বত আছে, সেগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলিতেছে—নদহ্রদে কত জাহাজ চলিতেছে—ইত্যাদি সকল ব্যাপারের খুঁটিনাটিটুকু পর্য্যন্ত তিনি দেখিয়া লইলেন। ফুকুসিমার মুখে ভাবী শত্রুর—এত বড় একটা ব্যাপারের—সকল সংবাদ জানিতে পারিয়া জাপানীরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেল।

ঘোড়ার পিঠে চারি হাজার মাইল পথ অতিক্রম করা কিরূপ ব্যাপার, তাহা তোমরা অবশ্যই বুঝিতেছ! এইরূপ দেশ-হিতৈষণার ফলে জাপান আজ পৃথিবীর মধ্যে বড়দলের একজন হইতে পারিয়াছে।

(৩)

আর একজন জাপানীর নাম লেফ্‌টেন্যাণ্ট হিরোসি। তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা বড়ই অদ্ভুত। রুশের সহিত জাপানের যুদ্ধ ঘটিবার কিছু কাল পূর্ব্বে হিরোসি রুশ রাজধানীতে ছিলেন। সেখানে তিনি সম্ভ্রান্ত নাগরিকের ন্যায় বাস করিতেন। তাঁহাকে সকলেই খুব সম্মান-সম্ভ্রম দেখাইত।

একদিন সেখানে একটা মল্ল যুদ্ধের ব্যবস্থা হয়। বহু প্রসিদ্ধ মল্ল খেলায় যোগ দিয়াছিল। উহারা যে মল্লযুদ্ধ করিল, তাহা দেখিয়া সকলেই বাহবা দিল—আনন্দে অধীর হইল। বাস্তবিক দেশের লোকদিগকে গুণী ও বলবান্ দেখিলে কা'র

না আনন্দ হয় ? সেই খেলার স্থানে যাহারা উপস্থিত ছিল সকলেই একবাক্যে মল্লদিগের প্রশংসা করিতে লাগিল। হিরোসিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার কাণে যেন সেই একঘেয়ে প্রশংসার কথাগুলি শেলের মত বিঁধিতে লাগিল। কেন না তিনি জানিতেন যে, ঐ সকল রুশিয়ান্ মল্লেরা, জাপানী মল্লদিগের সহিত যুদ্ধে নিমেষমধ্যে কাবু হইয়া পড়িবে। সুতরাং তিনি তৎক্ষাণাৎ দাঁড়াইয়া কহিলেন— "এস, কে আমার সহিত্ লড়িবে।"

একটা বেটে লোকের এহেন সাহসের কথা শুনিয়া সেখানকার উপস্থিত সকলে তো হাসিয়াই আকুল ! রুশিয়ান্ বন্ধুরা বার বার হিরোসিকে এরূপ কাজ হইতে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। রুশিয়ার ভীম-দেহ মল্লদের কাছে এই বামন লোকটীকে—হাতীর কাছে পিপীড়ার তুল্য মনে করিয়া দর্শকগণ কতই না বিদ্রূপ করিতে লাগিল। হিরোসি সকলের মন্তব্য শুনিয়া কেবল এইটুকু বলিল যে, "আপনারা কেহই জাপানের মল্ল-ক্রীড়া দেখেন নাই, তাই দেশের লোকের প্রশংসার কথা শতমুখে বলিতেছেন।"

হিরোসি হটিলেন না, কাজেই কুস্তি আরম্ভ হইল। এই ক্ষুদ্র-দেহ জাপানী যে, কুস্তির আরম্ভেই হারিয়া নাকালের একশেষ হইবে, তাহা দেখিবার জন্য দর্শকেরা, উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে একে একে ৪।৫ জন বড় বড় জোয়ান—রুশিয়ান্ ডন্‌গির আসিয়া হিরোসির সহিত

কুস্তি ধরিল। কিন্তু ধরা মাত্রই পড়া—আর তৎক্ষণাৎ পরাজয় স্বীকার !! দর্শকদের মুখের সমুদয় উৎসাহ উৎফুল্লতা নিমেষে নিভিয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই যাহারা হাসির তরঙ্গে মল্লক্ষেত্র মাতাইয়া ছিল, তাহারা কাল মুখ লইয়া ঘরে ফিরিতে লাগিল।

কেবল একটী বৃদ্ধ রুশিয়ান্ তাঁহার তিনটী কন্যা লইয়া আসিয়া হিরোসির সহিত করমর্দ্দন করিলেন। হিরোসিকে কোন কথা বলিতে না দিয়াই তিনি বলিলেন, "যুবক ! আমি তোমার বীরত্বে বড় মুগ্ধ হইয়াছি—আমার এই মেয়েরাও তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে। দেখ ইহারা সকলেই পরম রূপবতী; এদের যা'কে ইচ্ছা তুমি বিবাহ কর।"

কোথায় কুস্তিতে হারিয়া অপমান ঘটিবে—তা না—এ একেবারে সম্ভ্রান্ত ঘরে বিবাহের সম্মান উপস্থিত !! হিরোসি স্বদেশপ্রাণ যুবক—সুতরাং তিনি প্রলোভনে পা বাড়াইলেন না। সবিনয়ে বলিলেন—"ক্ষমা করিবেন মহাশয়, কা'ল আপনার প্রস্তাবের উত্তর দিব।"

পরদিন যথাসময়ে রুশীয়ান্ ভদ্রলোক উপস্থিত হইলে হিরোসি উত্তর দিল—"দুদিন পরেই রুশিয়ার সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধিবে; আপনার কন্যাকে বিবাহ করিয়া, বিপদের সময় আমার জন্মভূমি জাপানের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন না করা—আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আবার

জাপানের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিলে রুষের সহিত প্রাণান্তকর শত্রুতা করিতে হইবে ; আপনার কন্যাকে তেমন অশান্তিতে ফেলাও কখনই উচিত নহে। অতএব আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার প্রস্তাব পালন করিতে পারিব না।”

‘শত্রুর ঘরের সুন্দরী মেয়ে বিবাহ করিয়া সুখে দিন কাটান অপেক্ষা—জন্মভূমির জন্য প্রাণ দেওয়াই কর্ত্তব্য’—হিরোসির প্রাণে সেই ধারণাই ছিল প্রবল। সুতরাং তিনি উপস্থিত প্রলোভন অনায়াসে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরেই রুষের সঙ্গে জাপানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিল। হিরোসি তখন সেই বিপৎকালে ঘোরতর বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে

পড়ুয়া ইটালীদেশের একটি ক্ষুদ্র সহর। দুই এক শত নহে, সাত শত বৎসর যাবৎ এইস্থানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিছু দিন হইল পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের "সপ্তশত সাংবৎসরিক" উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে পৃথিবীতে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহার সকলগুলিতেই নিমন্ত্রণ পাঠান হইয়াছিল।

নিমন্ত্রণ পাইয়া আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক পড়ুয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর নানাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন প্রায় পাঁচ শত।

ইটালীয়েরা এই অতিথিদিগকে খুব আদর যত্ন করিয়াছে। নগরটী ছোটখাট হইলেও অতিথিদের আদর অভ্যর্থনা বেশ্ ভালই হইয়াছিল।

পড়ুয়ার অধ্যাপক বালিনী এই উৎসবের কার্য্যাধ্যক্ষ

ছিলেন। ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল স্বয়ং উৎসবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত হইলেও, ভারতবর্ষ অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা এখানে সর্ব্বপ্রধান সম্মান লাভ করিয়াছেন। কেমন করিয়া তাহা হইল, সেইটি বেশ্ কৌতুক-কর কথা। সে কথা বলিতেছি।

প্রতিনিধিরা সকলেই এক একটা অভিভাষণ পাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সে অভিভাষণ তো আর দুকথায় শেষ হইতে পারে না। রচনাও আবার দুপাঁচখানা নহে—প্রতিনিধিদের জনপ্রতি একখানা হিসাবে একবারে পাঁচশ! এখন বুঝিয়া দেখ পাঁচশ বড় বড় রচনার পাঠ শেষ হইতে কত সময় লাগিবে, আর শ্রোতারা ধৈর্য্য ধরিয়া ততক্ষণ সে সকল কথা শুনিতে পারিবেন কি না। তা ছাড়া, আর এক কথা এই যে—কে আগে কে বা পাছে অভিভাষণ পাঠ করিবেন ?

এই সকল ভাবিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষ বালিনী মহোদয় একটা বেশ্ ফন্দী বাহির করিলেন। তিনি ঠিক করিলেন যে, অমুক অমুক জাতি রচনা পড়িবে, এমন কোন ব্যবস্থা হইবে না। কেন না বহুজাতি একই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, লেখাপড়া শিখে। কাজেই রচনাগুলিও জাতির হিসাবে বিভক্ত না হইয়া ভাষার হিসাবে বিভক্ত হইবে। এই ফন্দিতে দেখা

গেল যে ইউরোপে ছয়টি ভাষা, আমেরিকায় একটি এবং এশিয়ায় তিনটি ভাষা। এশিয়ার যে তিনটি ভাষা—তাহার মধ্যে আরব, পারস্য প্রভৃতিতে একভাষা, চীন জাপানে এক ভাষা, আর সংস্কৃতমূলক এক ভাষা অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষা।

ভাষা সম্বন্ধে রচনার ভাগ হওয়াতে কাজ অনেক কমিয়া গেল বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে ইউরোপ আগে কি আমেরিকা বা এশিয়া আগে অভিভাষণ পাঠ করিবে, ইহাই হইল বিষম সমস্যা। সেই সমস্যার মীমাংসার জন্য বালিনী মহোদয় একটা লটারী বা চিঠি খেলার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি প্রতীচ্য (ইউরোপ), আমেরিকা ও প্রাচ্যের (এসিয়ার) নাম তিনখানা কাগজে লিখিয়া ফুলের মত সুন্দরী একটী চারি বছর বয়সের মেয়েকে উহা হইতে কাগজ ছুঁইতে বলিলেন। বিধাতার এমনি বিচিত্র বিধান যে শিশুটি প্রথমেই এশিয়া অর্থাৎ প্রাচ্যের নাম লেখা কাগজখানা ছুঁইল। এই ব্যাপার দেখিয়া অধ্যাপক বালিনী, প্রাচ্যদেশে সংস্কৃতই প্রাচীনতম ভাষা ও বিদ্যার জননী বলিয়া ভারতবর্ষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিলেন। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা সর্ব্বাগ্রে অভিভাষণ পাঠ করিবার অধিকার পাইলেন !! ইউরোপে এর আগে এমন ভাবে আর কখনো ভারতবর্ষ প্রথম স্থান পায় নাই।

পরদিন খুব সমারোহে সভা আরম্ভ হইল। সকল দেশের

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হইলেন, ইটালীদেশের প্রায় এক লক্ষ ছাত্র সভায় যোগদান করিল; চীন, জাপান ও পারস্যের দূতগণ আর ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল সভায় উপস্থিত হইলেন। এই বিপুল জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া সর্ব্বাগ্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-মধ্যে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিলেন। যতক্ষণ তিনি কবিতাটি পাঠ করিতে-ছিলেন, সভা ততক্ষণ এমন নিঝুম হইয়া রহিয়াছিল যে, মানুষের শ্বাসের শব্দটি পর্য্যন্ত শোনা যাইতেছিল না। কবিতাপাঠ শেষ হইলে সভার চারিদিক হইতে লক্ষ লক্ষ লোক গগনভেদী শব্দে পরম উৎসাহে ভারতবর্ষের নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সভার পর কত আমোদ আহ্লাদ নাচ-গান হইল। সন্ধ্যাকালে সমস্ত নগর আলোক-মালায় শোভিত হইল। ৩০ হাজার সৈন্য ইটালীর জাতীয় পোষাক পরিয়া ও অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়াছিল—অতিথিদিগকে সম্মান করিতেছিল—তিনশ’ উড়ো জাহাজ ইটালীর নিশান উড়াইয়া আকাশে ঘুরিতেছিল! সে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড!

সভার তৃতীয় দিন উপাধি দান। পডুয়ার রেক্‌টর ও ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল প্রতিনিধিদিগের মধ্যে ৫০ জনকে ‘ডাক্তার’ উপাধি দিলেন। আমাদের শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় এই সম্মান পাইয়া ভারতবর্ষকে সম্মানিত

করিয়াছেন! তোমরা মনে করিও না—এই উপাধি সামান্য। একদিন মহাত্মা গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস প্রভৃতি এই উপাধি পাইয়া অতিশয় সম্মানিত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের এই সম্মানের কথা শুনিয়া তোমরা কতই না খুসী হইবে, আমরাও কতই না আহ্লাদিত হইতেছি। আমাদের নীতিশাস্ত্রে আছে 'বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে' অর্থাৎ বিদ্বানেরা সকল স্থানেই সম্মান পান। এই ব্যাপারে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

অমরনাথ

অমরনাথের বয়স পঁচিশ বৎসর মাত্র। জাতিতে বাঙ্গালী বৈদ্য। পিতার নাম ৺ উপেন্দ্রনাথ সেন। তিনি রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যে আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অমরনাথ কলিকাতা নেবুতলা হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেণ্ট্ জেভিয়ার্স্ কলেজে কিছুকাল পড়েন। ইংরেজী ভাষায় তিনি অতিশয় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

শিশুসাথীর পাঠকপাঠিকাগণ, তোমরা সংবাদপত্রে—পাঠ্য পুস্তকে—প্রায়ই পড়িতে পাও যে, বাঙ্গালী বড় ভীরু—বড় কাপুরুষ। উহা যে সত্য কথা নহে—সুযোগ পাইলে যে বাঙ্গালীর ছেলে সাহস ও বীরত্ব দেখাইতে পারে, তাহার অনেক প্রমাণ তোমরা শিশুসাথী পাঠ করিয়া পাইয়াছ। আজ আবার অমরনাথের কাহিনী পড়িয়া তাহার আর একটা চমৎকার প্রমাণ পাইবে।

স্কুলে পড়ার সময়ই অমরনাথ বয়েজ স্কাউট দলে প্রবেশ করেন। এখানে কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি 'কিংস্ স্কাউট'এর

অমরনাথ

একদলের সর্দ্দারী পান। কিছুকাল পরে ইয়োরোপের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বয়েজস্কাউট মাষ্টার স্যার ফ্রান্সিস্ কার্টার্ সুপারিশ করিয়া অমরনাথকে একটা যুদ্ধ জাহাজের দ্বিতীয় লেফ্‌টেনেণ্ট পদে নিযুক্ত করেন।

অমরনাথ ঐ জাহাজে ইউরোপ যান—ইংরাজ অধিকারের নানা স্থান হইতে সৈন্য আনিয়া ফ্রান্সে পৌঁছাইয়া দেন। পর বছর তিনি রেঙ্গুন, যাভা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও গমন করেন।

এ বছর ১৯২৩ খৃঃ অঃ আমেরিকার ওয়াসিংটন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে অমরনাথ বাণিজ্যশাস্ত্রে B. Com. উপাধি ও পোষাক লাভ করিয়াছেন। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে—অমরনাথের বয়স এখন মাত্র পঁচিশ বছর! সমুদ্র দেখিতে—সমুদ্রে বেড়াইতে—অমরনাথের বাল্যকাল হইতেই খুব আগ্রহ ছিল। এজন্য তিনি বাল্যকালেই একবার বাড়ীর কাহাকেও না জানাইয়া রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছিলেন। শেষে নিজের সাহস, চেষ্টা ও কার্য্যদক্ষতার ফলে অমরনাথের—শুধু সমুদ্র নহে—সমস্ত পৃথিবীতে বেড়াইবার সাধ মিটিয়াছে।

চেষ্টা করিলে এবং দৃঢ়পণ করিলে—তোমরাও এইভাবে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে পারিবে।

৮ কুঞ্জলাল নাগ

ঢাকা জিলায় বারদী একটি অতি বড় প্রসিদ্ধ গ্রাম! গ্রামের যাঁহারা জমীদার, তাঁহাদের উপাধি 'নাগ'। ইঁহারা কায়স্থ। নাগ পরিবারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের জন্যই বারদী গ্রাম প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী হিমালয় বেড়াইয়া আসিয়া এই গ্রামে জীবনের অবশিষ্টকাল কাটান। তিনি 'বারদীর ব্রহ্মচারী' নামেই প্রসিদ্ধ। তাঁহার বাসস্থান বলিয়াও বারদী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বাবু কালীকৃষ্ণ নাগ ছিলেন এই বারদীর একজন প্রসিদ্ধ জমিদার। কুঞ্জলাল তাঁহারই পুত্র। ১৭৮০ শকে বাঙ্গালা ১২৬৫ সালের ১লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, কুঞ্জলাল জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে বারদীতেই তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। তার পর তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হ'ন। ১৬ বছর বয়সে কুঞ্জলাল এখান হইতে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন এবং দশ টাকা মাসিক বৃত্তি পান। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, লেখাপড়ায় তিনি কেমন ছাত্র ছিলেন।

এণ্ট্রান্সে বৃত্তি পাইয়া তিনি ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হ'ন। দু-বছর পর মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তিসহ এল্, এ, পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হ'ন। এরপর তিনি বি-এ পড়িতে আসেন কলিকাতায়। জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজ হইতে তিনি বি-এ পাশ করেন। এই পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি

রাধাকান্ত দেব প্রদত্ত 'রাধাকান্ত পদক' নামক সোনার মেডেল পান। শেষে তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে অনার পাইয়া এম্-এ পাশ করেন।

বর্দ্ধমান রাজকলেজের প্রিন্সিপালের পদ শূন্য হইলে, কলেজের কর্ত্তারা—বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এল্‌ফ্রেড্‌ ক্রফ্‌ট্‌ সাহেবের নিকট একজন যোগ্য লোক চাহিয়া পাঠান। সাহেব ঐ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ পদে কুঞ্জলালকে নিযুক্ত করেন। এই সময় কুঞ্জলালের বয়স মাত্র তেইশ বৎসর। তোমরা মনে করিয়া দেখ, যে কত বিদ্যা থাকিলে তেইশ বৎসরের নবীন যুবক একটা কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইতে পারে। আর শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবও কতখানি গুণের পরিচয় পাইয়া, কলেজ হইতে সদ্য বাহির হওয়া একটি যুবককে অত বড় পদে নিযুক্ত করিতে পারেন।

বর্দ্ধমান কলেজে বছর দুই কাজ করার পর ঢাকায় জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কলেজের কর্ত্তারা কুঞ্জলালকে অধ্যক্ষ পদ দিতে ইচ্ছুক হইলেন—কুঞ্জবাবু সংবাদ পাওয়া মাত্র জগন্নাথ কলেজের কাজ স্বীকার করিলেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে প্রিন্সিপাল হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। ঢাকার ছেলে ঢাকায় ফিরিয়া গেল। এখানে তিনি স্বয়ং ইংরেজী, সংস্কৃত, গণিত ও লজিক পড়াইতেন। অথচ তিনি সংস্কৃতে এম্‌-এ পাশ করিয়াছিলেন। কুঞ্জলাল বাবুর বিদ্যা কত বিষয়ে কিরূপ গভীর ছিল, এই অধ্যাপনার ব্যাপার হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি সেক্‌স্‌পীয়ারের প্রণীত পাঠ্য পুস্তকগুলি এমনি রুচিকর করিয়া

পড়াইতেন যে, পড়া শুনিবার জন্য ঢাকা কলেজের ছেলেরা নিজ কলেজ ছাড়িয়া জগন্নাথ কলেজে চলিয়া আসিত এবং ঘণ্টা শেষ হইলে তবে কলেজে ফিরিত। তাঁহার আমলে জগন্নাথ কলেজের সর্ব্বত্র সুনাম হইয়াছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মেট্রেপলিটন কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসেন। তৎপূর্ব্বে কিছুকাল বঙ্গবাসী ও রিপন কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। আগরতলার মহারাজ তথায় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে কুঞ্জবাবুই প্রথমে প্রিন্সিপাল হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে আগরতলা কলেজ উঠিয়া যায়। অতঃপর তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপক হন। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তিনি সেই কাজেই নিযুক্ত ছিলেন।

ভারতবর্ষে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেগুলির একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েক বছর আগে স্যাড্‌লার কমিশন বসে; সেকথা তোমরা জান। কমিশনের কর্ত্তা স্যাড্‌লার বিলাতের অতিবড় সুশিক্ষিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কমিশন বিদ্যা-সাগর কলেজে দেখিতে গেলে—সংস্কৃতে এম-এ কুঞ্জবাবুকে ইংরাজী পড়াইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হ'ন। তখন কুঞ্জলাল, স্যাড্‌লার সাহেবের সম্মুখে—শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য—সেক্‌স্‌পিয়ারের গ্রন্থ পড়ান। কুঞ্জবাবুর অধ্যাপনা শুনিয়া সাহেব মুক্তকণ্ঠে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বলেন যে —"বিলাতেও খুব কম অধ্যাপকই এমন ভাবে সেক্‌স্‌পীয়ারের

গ্রন্থ পড়াইতে পারেন।" কুঞ্জবাবু যে শুধু অগাধ বিদ্বান্ ছিলেন তাহা নহে—তিনি সেই বিদ্যা ছাত্রদিগকে অবলীলা-ক্রমে দান করিতেও অতিশয় নিপুণ ছিলেন।

প্রথম জীবনে কুঞ্জবাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেও, জগন্নাথ কলেজে অবস্থান কালেই তিনি উহার সংশ্রব ছাড়িয়া দেন; শেষ জীবনে তিনি আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। বারদীর নাগ পরিবারে তাঁহার মত প্রগাঢ় বিদ্বান্ আর কেহ ছিল না। তিনি ছাত্রগত-প্রাণ ছিলেন—সর্ব্বদা তাহাদের হিতের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। কত ছাত্র—নিঃস্ব বালক—যে কুঞ্জলালের সাহায্যে লেখাপড়া শিখিয়াছে—কত আত্মীয়স্বজন যে তাঁহার অর্থ সাহায্য পাইয়া উপকৃত হইয়াছে—তাহার সীমা নাই। এরূপ চরিত্রবান্ লোক খুব কমই পাওয়া যায়। এসকল গুণ ছাড়াও তিনি বহু গুণের আধার ছিলেন। তিনি যেমন গীত-রচক ছিলেন তেমনি গান ও বাদ্যে নিপুণ ছিলেন। বিদ্যাদানই কুঞ্জবাবুর একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ছিল। গবর্ণমেণ্ট বারংবার তাহাকে ডেপুটিগিরি চাকুরী দিতে চাহিলেও—কুঞ্জবাবু অধ্যাপনা ছাড়িয়া সে কাজ লইতে চাহেন নাই।

গত ১৩৩০ সনের ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার, রাত্রি ১টার সময় পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে এই আদর্শ অধ্যাপক, কুমিল্লা নগরে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ নাগ বি-এল মহাশয়ের বাসায় আমাশয় রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কুমিল্লা জজকোর্টের উকীল।

অন্ধ কালীজীবন

কালীজীবন জন্মান্ধ। আমরা চোখ বুজিলে বাইরে কিছু দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু চোখ মেলিয়া যাহা দেখিয়াছি—চোখ বুজিলে সেই দেখা জিনিষগুলির ছবি মনে পড়ে। জন্মান্ধের পক্ষে কিন্তু সবই অন্ধকার—তাহার মনে কোন কিছুরই ছায়া পড়ে না। কাজেই অন্ধ কালীজীবনের কাছেও জগৎ অন্ধকারময় ছাড়া আর কিছু নহে।

যে অন্ধ তাহার জন্য তো আর শিখিবার কোন ব্যবস্থা নাই! কাজেই কালীজীবনের বয়স দিন দিন বাড়িলেও তাহার জন্য কোন শিক্ষার ব্যবস্থা হইল না। কিন্তু দশজনের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে বেশ্ কথোপকথন করিতে শিখিল। এই ভাবে তাহার বয়স বাড়িয়া হইল নয় বছর।

এই সময় সে একদিন দাদাকে পড়ার পুঁথি আবৃত্তি করিতে শুনিয়া সেই পড়াটুকু শিখিয়া লইল। অমনি বাবার কাছে যাইয়া সেই পড়া বলিল। তাহার বাবা, কালীজীবনের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন—আর সেইদিন হইতে নিজেই এই অন্ধ ছেলেটির শিক্ষার ভার

লইলেন। কালীজীবন তাহার পিতার কাছে বসিয়া মুখে মুখে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু একবছর যাইতে না যাইতেই কালীজীবনের বাবার মৃত্যু হইল—কয়েকমাস পরে তাহার মাও স্বর্গে গেলেন।

কালীজীবনের দাদা—পনের বছরের ছেলে বীরেশ্বর—এখন সংসারে কর্ত্তা। অন্ধ ছোট ভাইটি ছাড়া তাহার আরো দুইটি ছোট ভগিনী ছিল। দারুণ অভাব লইয়া বীরেশ্বর কোনরূপে চারিজনের খাওয়া পড়ার ব্যাপার চালাইয়া লইলেন বটে, কিন্তু অন্ধ ভাইটির শিক্ষার জন্য কোন কিছু ব্যবস্থাই করিতে পারিলেন না।

কয়েক বছর কষ্টে সৃষ্টে কাটাইবার পর একটি ভগিনী বড় হইয়া উঠিল—তাহাকে বিবাহ দিতে হইল। দরিদ্র বীরেশ্বর আর কোন উপায় না পাইয়া ঘরবাড়ী বাঁধা দিয়া বিবাহের টাকা কর্জ্জ করিলেন। গরীব পাইয়া মহাজনেরাও নাকি এসময় বীরেশ্বরের প্রতি কতই না কঠোর ব্যবহার করিয়াছিল। বালক বীরেশ্বর এরূপ কঠোর দুরবস্থায় এমনি দিক্‌বিদিক্ শূন্য হইয়া পড়িলেন যে, একদিন আত্মহত্যা করিয়া সকল কষ্ট দূর করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরের সে চেষ্টা সফল হইল না—তিনি মরিতে পারিলেন না।

কিছুদিন পরে সকলের ছোট ভগিনীটিকেও বিবাহ দিতে হইল। এবার দুই ভাই নিরাশ্রয়ের মত হইলেন—চারিটি ভাত
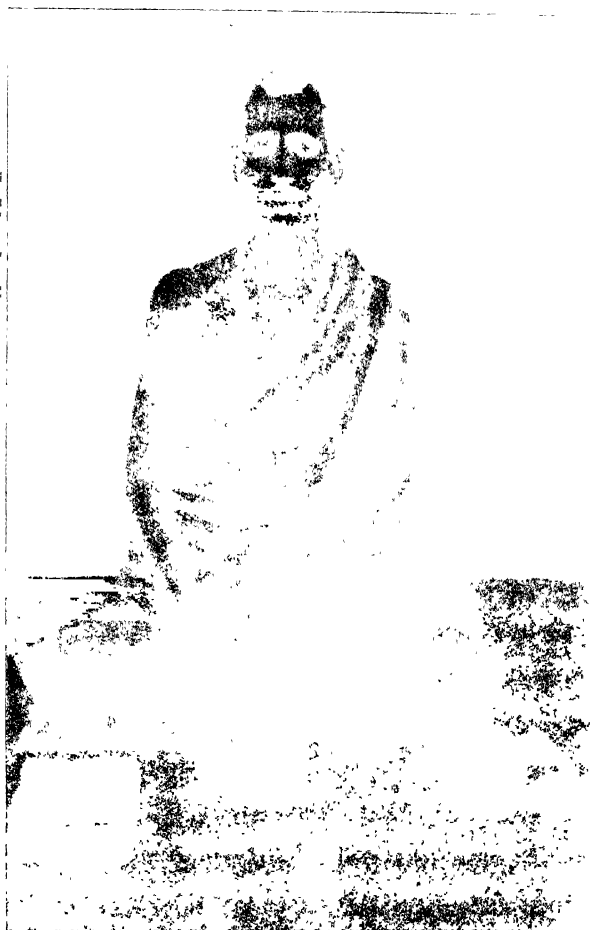
বাঁধিয়া দিবার মানুষও আর ঘরে রহিল না। অন্ধ ভাইটিকে লইয়া বীরেশ্বরের কত কষ্ট হইতে লাগিল তাহা অবশ্যই তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। দুই ভাই নিরুপায় হইয়া অবশেষে মাতুলবাড়ী চলিয়া গেলেন। সেখানেও তাহারা বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না—বছর ফিরিতে না ফিরিতেই দুই ভাইকে আবার বাপের ভিটায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

অন্ধ কালীজীবনের নিকট আমরা তাঁহার বাল্যজীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন, দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষুদুটি বিস্ফারিত করিয়া—তিনি যে সকল কাহিনী কহিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে মানুষমাত্রেরই চক্ষে জল আইসে। মাতুলবাড়ী যাইয়াও তাঁহারা দুই ভাই মোটেই শান্তি পান নাই। এই সময়ের কাহিনী বলিতে বলিতে কালীজীবন বলিয়াছিলেন—'মামাবাড়ীর কাছেই একটা বটগাছ ছিল। যখন দুঃখকষ্ট অসহ্য হইত, তখন কোনরূপে হাতরাইয়া হাতরাইয়া পথ চলিতে চলিতে বটতলা যাইতাম। সেই নির্জ্জনস্থানে একাকী বসিয়া একাগ্রমনে কেবল নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—নিরবলম্বের অবলম্বন—ভগবান্‌কে ডাকিতাম।'

খাওয়া—পরা—থাকার শতপ্রকার অভাবের মধ্যেও কালীজীবনের মনে বিদ্যাশিক্ষার জন্য অসীম আগ্রহ ছিল। কাহারো কাছে কিছু শিখিতে পাইলে কিংবা শিখিবার সুযোগ হইবে জানিলে—পৃথিবীর কোন অভাবই, কালীজীবনের মনে থাকিত না; বরং তিনি উৎসাহ উদ্যমে অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া

উঠিতেন। কিন্তু অন্ধের পক্ষে অনেক ব্যাপারই ভাবনায় শেষ হইয়া যাইত, কাজে বড় কিছুই ফলিত না।

মামাবাড়ী হইতে দুই ভাই দেশে ফিরিলেন। গ্রামেই একটি টোল ছিল। কালীজীবন কোনরূপে পথ চলিয়া সেই টোলে যাইতেন—টোলের এক কোণে বসিয়া পড়ুয়াদের পড়া শুনিতেন। তাহাতে কালীজীবনের আশা বিন্দুমাত্রও মিটিত না। অধিকন্তু শিখিবার জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষাই মনে জাগিত। একদিন টোলের ছেলেরা একটা কথার উত্তর দিতে পারিল না—কালীজীবনের তাহা জানা ছিল, কাজেই তিনি টোলের এক কোণ হইতে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সকলেই ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইল। সেই দিন হইতে কালীজীবনের পড়ার একটু সুযোগ হইল। একজন পড়ুয়া দয়া করিয়া তাহাকে পড়াইতে স্বীকার করিলেন। এ ব্যাপারে শিক্ষাপাগল কালীজীবনের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। এই বন্দোবস্ত হইল যে, কালীজীবন যাহা শিখিয়াছিল টোলের প্রথম পাঠার্থী-দিগকে তাহা শিখাইবে—আর অধ্যাপক স্বয়ং কালীজীবনকে পড়াইবেন; ছাত্রগণের কেহ কেহও কালীজীবনকে পাঠ পড়িয়া শুনাইবেন। এই ভাবে কালীজীবনের পড়া আরম্ভ হইল।

পাড়াগাঁয়ের অবস্থা বর্ষাকালে কিরূপ হয়, সহরের লোকেরা তাহা বুঝিতেই পারে না। বাড়ী হইতে টোল পর্য্যন্ত যাইতে কালীজীবনকে চারিটা বাঁশের সাকো এবং

কয়েকটা নালা অতিক্রম করিতে হইত। বর্ষার জলে বাড়ী-ঘর ডুবিয়া যায়—কাজেই কালীজীবন গামোছা খানা পরিয়া টোলে রওয়ানা হইতেন—দুপাশের গাছ লতা ধরিয়া ধরিয়া পথ চলিতেন। কোন কোন নালায় এত জল থাকিত যে, তাহা পার হইতে তাহার নাক কান পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইতে চাহিত। এভাবে তিনি সকাল দুপুর ও সন্ধ্যা কালে পড়িবার স্থানে যাইতেন—আবার বাড়ী ফিরিতেন। সাপ পোকা বা জোঁক কিছুই গ্রাহ্য করিত না। যখন তাহার মনে হইতে যে, তিনি অনেক কথা শিখিয়াছেন—আরো কত শিখিতে পাইবেন—তখন তাঁহার মনে আনন্দ আর ধরিত না। সংসারের সকল অভাব ভুলিয়া তিনি আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন।

ছেলেরা সকলেই আপন আপন পড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিত, সুতরাং কালীজীবন পাঠ শুনিবার জন্য বেশী সময় পাইতেন না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই তিনি অত কষ্ট করিয়া টোলে যাইতেন। কেবল খাইবার জন্যই দুবেলা বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন—আর দিন রাত পড়ার স্থানে পড়িয়া থাকিতেন। রাত্রে যাহাতে বেশী পড়া হয়, সে জন্যও কালী জীবনের কতই না চেষ্টা ছিল। ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িলে পাছে শেষ রাত্রিতে পড়ার ব্যাঘাত হয়, এজন্য কালীজীবন হাটুর নীচে, পায়ের নালায় বেশ শক্ত করিয়া একটা দড়ি বাঁধিয়া রাখিতেন। উহাতে রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া পা ফুলিয়া উঠিত—টন্‌টন্ করিয়া যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহিত।

এই যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত—অমনি সকল পড়ুয়াকে ডাকিয়া তুলিয়া পড়াইতেন—নিজের পাঠও শুনিয়া লইয়া লিখিয়া ফেলিতেন।

কালীজীবনের স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। কয়েকবার শুনিলেই শ্লোক, সূত্র প্রভৃতি গদ্য পদ্য তাঁহার মুখস্থ হইয়া যায়। এখনও তাহার স্মরণশক্তি তেমনি তীক্ষ্ণ আছে।

এইরূপে কয়েক বছর চেষ্টায় তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণে যে বিদ্যা লাভ করিলেন, তাহাতে প্রথম পরীক্ষা দেওয়া চলে। কালীজীবনও পরীক্ষা দিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়া উঠিলেন। ঢাকার সারস্বত সমাজে পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিলেন। কিন্তু সমাজের কর্ত্তারা উত্তর দিলেন যে, অন্ধকে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। এই উত্তরে কালীজীবন যেন মরার মত হইয়া গেলেন। তথাপি কিন্তু—তিনি বিদ্যাশিক্ষা ছাড়িয়া দিলেন না।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীজীবনের টোলে গেলেন। তিনি টোলের ছাত্রদিগকে তাঁহার সহিত সংস্কৃতে কথোপকথন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কেহই সাহসী হইয়া তাহাতে অগ্রসর হইল না জানিয়া কালীজীবন অগ্রসর হইলেন—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয় হইল—তিনি এই অন্ধ যুবকের, প্রতিভা, মেধা এবং শিক্ষার আগ্রহ দর্শনে খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

তাঁহারই চেষ্টায় শেষে কালীজীবন পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইলেন।

মাদারীপুরের নিকটবর্ত্তী কবিরাজপুরে তখন একটা পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল। কালীজীবন সেখানে পরীক্ষা দিতে গেলেন। বাড়ী হইতে মাদারীপুর যাইতে যে ষ্টীমার ভাড়া লাগে তাহার জন্য কালীজীবনকে ঘরের একমাত্র সম্বল পিতলের কলসীটিকে একটাকায় বিক্রয় করিতে হইল! যাহা হউক, যথাকালে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসিয়া অনেক বাধা বিঘ্নের পর তিনি পরীক্ষা দিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ একজন লোক দিলেন—কালীজীবন প্রশ্ন শুনিয়া যাহা উত্তর বলিয়া যাইতেন, ঐ লোক তাহা লিখিয়া লইত। যথাকালে পরীক্ষার ফল বাহির হইল—কালীজীবন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক বৃত্তি পাইলেন। অধ্যবসায়ের ফল ফলিল।

এইরূপে ক্রমে ব্যাকরণের আর আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শেষে তিনি উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আর পরীক্ষার খরচ চালাইবার উপায় ছিল না— পড়ারও তখন সুবিধা হইতেছিল না। কাজেই কালীজীবন নানা জনের মুখে শুনিয়া শুনিয়া স্থির করিলেন যে— কলিকাতায় গেলে পড়াশুনার ও ব্যয়ের সুবিধা হইবে। তাই তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এইখানে থাকিয়া ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষার জন্য শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। পরীক্ষার বছরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহাপ্রাণ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় কালীজীবনকে দুইশত ত্রিশ টাকা সাহায্য করিলেন। তাঁহারই দানের ফলে কালীজীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি পাইলেন 'ব্যাকরণ-তীর্থ।'

ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া—কালীজীবন দর্শনশাস্ত্র পড়িতে উৎসুক হইলেন। প্রথমে সাংখ্য দর্শন পড়িতে লাগিলেন। সাংখ্যের আদ্য পরীক্ষায়ও কালীজীবন বৃত্তি পাইয়াছিলেন। শেষে তিনি উপাধি পাইলেন "সাংখ্যতীর্থ।"

যতই শিক্ষালাভ হইতে লাগিল—ততই অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য কালীজীবন ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। সাংখ্যের উপাধি লাভের পর কালীজীবন বেদান্তের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ক্রমে পরীক্ষার সময় আসিল—কিন্তু তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। কেন না এই সময়ে তাহার মনে হইল যে, পরীক্ষায় প্রস্তুত হইতে গেলে কেবল নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের কতকটুকু মাত্র অংশ পড়িতে হয়; সমুদয় গ্রন্থ পড়িতে হয় না। কাজেই কোন শাস্ত্র বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয় না। এই মনে করিয়া কালীজীবন পরীক্ষার জন্য পড়া ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনভাবে দর্শনশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় অসবর্ণ-বিবাহ বিষয়ক আইনের প্রতিবাদ উপলক্ষে এক সভা হয়। কাশীমবাজারের মহারাজ—বাঙ্গালার বিক্রমাদিত্য—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই, মহোদয় সে সভায় সভাপতি হন। কৌতূহলী কালীজীবনও আলোচনা শুনিবার জন্য সেই সভায়

গিয়াছিলেন। সভ্যগণের বক্তৃতা শুনিয়া কালীজীবনও তথায় একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহারাজ এই ব্রাহ্মণ যুবকের অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া উঁহাকে মাসিক দশ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন।

জ্ঞানপিপাসু কালীজীবন কিন্তু সেই দশটাকা দিয়া একজন পাঠক নিযুক্ত করিয়াছেন। পাঠকমহাশয় কালী-জীবনের কাছে থাকিয়া তাঁহাকে নানা গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন। কলিকাতায় ভবানীপুরের ৩৬নং বলরাম বসুর ঘাট রোড নিবাসী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কালীজীবনকে খাইতে দেন। উপরিউক্ত বলরাম বসুর ঘাটের উপর অতি ক্ষুদ্র একটি কুঠরীতে থাকিয়া এই জন্মান্ধ ব্রাহ্মণ যুবক বিদ্যাদেবীর আরাধনায় দিন যাপন করিতেছেন। স্থানীয় কোন কোন সহৃদয় মহাত্মাও কালীজীবনকে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন, সময় সময় কোথাও কোথাও তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, তাহাতেও কিছু কিছু বিদায় পান।

কালীজীবনের লোভহীনতা, ত্যাগ ও সংযম এবং বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহ দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। চেষ্টা করিলে মানুষ শিক্ষায় কিরূপ উন্নত হইতে পারে—কত বিদ্যালাভ করিতে পারে, কালীজীবন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ইউরোপের বা আমেরিকার কত অন্ধ বধিরের জীবনের কথা এদেশের পত্রিকায়—পাঠ্যপুস্তকে প্রকাশ করা হয়;

কিন্তু নিজের দেশের এ সকল অপূর্ব্ব রত্নের সন্ধানও বড় কেহ রাখে না।

কালীজীবনের পৈতৃক বাড়ী বরিশাল জিলার অন্তর্গত চাঁদসী গ্রামে। তাঁহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

নষ্ট-চন্দ্র

ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথির চন্দ্রের নাম নষ্ট-চন্দ্র। রাত্রিতে ঘরের চালে ও বেড়ায় দমাদম ঢিল পড়িলেই অনেকে বুঝিয়া থাকেন যে আজ নষ্ট-চন্দ্র।

পুরাণে লেখা আছে যে, চন্দ্র এই ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিতে দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চুরি করিয়াছিলেন, সেই জন্য এই তিথির চন্দ্রের নাম নষ্ট-চন্দ্র, কাজেই নষ্ট-চন্দ্র দেখিতে নাই। যদি কেহ হঠাৎ দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাকে সে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তটা মোটেই কঠিন নহে। কেননা—

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তব হ্যেষঃ স্যমন্তকঃ॥ *

এই শ্লোকটি পড়িয়া জলপান করিলেই নষ্ট-চন্দ্র দেখার পাপ দূর হয়।

---

* সিংহ প্রসেনজিৎকে বধ করিয়াছিলেন, আবার জাম্ববান্ সিংহকে বধ করিয়াছিল। হে সুকুমার! তুমি আর কাঁদিও না, এই স্যমন্তক মণিটি তোমারই।

নষ্ট-চন্দ্র তিথিতে স্যমন্তক উপখ্যান শুনিতে হয়। তাহা শুনিলে মিথ্যা কলঙ্ক হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

সংক্ষেপে তোমাদিগকে স্যমন্তক উপাখ্যান বলিতেছি।

রাজা সত্রাজিৎ বড় সূর্য্যভক্ত ছিলেন। সূর্য্যদেব সত্রাজিৎকে একটি অতি উজ্জ্বল মণি দেন। মণিটির নাম স্যমন্তক।

একদিন সত্রাজিৎ উহা গলায় পড়িয়া দ্বারকায় যান। দ্বারকার লোকেরা দূর হইতে দেখিল যে, একটি জ্বলন্ত সূর্য্য যেন ভূমির উপর দিয়া নগরের দিকে আসিতেছে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দিল যে "স্বয়ং সূর্য্যদেব আপনার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিমুখে কহিলেন যে, উহা সূর্য্য নহে—সত্রাজিতের কণ্ঠস্থিত স্যমন্তকমণি। তাহা শুনিয়া দ্বারকাবাসীরা চুপ করিয়া গেল।

স্যমন্তক মণিটিকে যে কেবল দেখিতেই সূর্যের মত ছিল তাহা নহে, উহার কতকগুলি বিশেষ গুণও ছিল। মণিটি যাহার কছে থাকিত, সে প্রতিদিন আট ভার সোণা পাইত। তা ছাড়া সে দেশে কোন দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অকাল মরণ, রোগ প্রভৃতি ঘটিত না।

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের কাছে ঐ মণিটি চাহিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ কিন্তু কিছুতেই উহা শ্রীকৃষ্ণকে দেন দেন নাই। শ্রীকৃষ্ণও আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরে, সত্রাজিতের কনিষ্ঠ ভাই প্রসেনজিৎ মণিটি পরিয়া শিকারে গেলেন। কিন্তু আর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন না।

প্রসেনজিৎ ঘরে ফিরিল না দেখিয়া সত্রাজিৎ বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। শেষে তিনি কাহারও কাহারও কাছে প্রকাশ করিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ মণিটি চাহিয়াছিলেন, তাঁহাকে উহা দান করি নাই, বোধ হয় সেই মণিটির জন্য তিনিই প্রসেনজিৎকে মারিয়া ফেলিয়াছেন।" লোকেরাও এই কথা লইয়াই কানা-কানি করিতে লাগিল।

কথাটা ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের কানে গেল। তিনি বড়ই বিস্মিত হইলেন। পরে, তিনি যে নরহত্যা বা মণিচুরি, ইহার কিছুই করেন নাই, তাহারই প্রমাণ দিবার জন্য দ্বারকার কতকগুলি লোককে লইয়া বনে চলিলেন। উদ্দেশ্য প্রসেনজিতের খোঁজ করা—মণির সন্ধান করা।

যে পথে প্রসেনজিৎ ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও ঘোড়ায় পায়ের চিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া সেই পথে চলিলেন। বহু দূর যাইয়া এক বনের মধ্যে তাঁহারা প্রসেনজিৎ ও তাহার ঘোড়াটা মৃত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, ঐ স্থানে ঘোড়ার পায়ের চিহ্নের সহিত সিংহের পায়ের চিহ্নও স্পষ্টই রহিয়াছে। দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে হইল, হয়ত সিংহই প্রসেনজিৎকে মারিয়া ফেলিয়াছে—চক্‌চকে দেখিয়া মণিটা লইয়া গিয়াছে।

এই ভাবিয়া তিনি আবার সিংহের পায়ের চিহ্ন দেখিতে দেখিতে বনের পথে যাত্রা করিলেন। বহু দূর যাইয়া তিনি এক পর্ব্বতের গুহার কাছে দেখিতে পাইলেন, একটা সিংহ মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

চারিদিকে ঘোর অরণ্যবেষ্টিত পাহাড়। পাহাড়ের নীচে একটা সুরঙ্গ। সেই সুরঙ্গে যে সর্ব্বদা লোক যায় আসে তাহারও বেশ স্পষ্ট চিহ্নই রহিয়াছে। তখন তিনি উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুরঙ্গের ভিতরটা একবার দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। সঙ্গের লোকদিগকে বাহিরে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ পর্ব্বতের সুরঙ্গে প্রবেশ করিলেন।

সুরঙ্গের পথটা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সাবধানে উহার মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন—কে যেন বলিতেছে—

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তব হ্যেষঃ স্যমন্তকঃ॥

প্রসেনে বধিয়াছিল সিংহ দুরাশয়,
জাম্ববান্ পাঠাইল সিংহে যমালয়।
কেঁদ না কুমার! তুমি সুবোধ বালক,
এই যে তোমারি দেখ মণি স্যমন্তক।

শ্রীকৃষ্ণ যে জন্য বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া এই পাহাড়ের সুরঙ্গে ঢুকিয়াছেন এ যে সেই কথা! কথাগুলি শুনিয়া তিনি একান্তই চমৎকৃত হইলেন! যে দিক হইতে এই কথার শব্দ

আসিতেছিল তিনি সেই দিকে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটি শিশুকে লইয়া তাহার ধাই খেলা দিতেছে। শিশুটির সম্মুখে স্যমন্তক মণিটি জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে—উহার জ্যোতিতে গুহার ভিতরটায় দিনের মত আলোক হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কাছে যাইতেই শিশুর ধাই ভয়ে ভয়ানক চেঁচাইয়া উঠিল। চীৎকার শুনিয়াই জাম্ববান দৌড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মণিটি লইতে চাহেন—জাম্ববান তাহা দিতে চাহেন না। ফলে দুই জনে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদিন দুইদিন নয়, একে একে আটাশ দিন যুদ্ধের পর জাম্ববান হারিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানকে বলিলেন—"প্রসেনজিৎকে মারিয়া আমি মণি লইয়াছি—লোকে আমার নামে এই মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিতেছিল। সেই কলঙ্ক দূর করিবার জন্যই আমি মণিটির সন্ধান করিতে করিতে এখানে আসিয়াছি। কলঙ্ক মোচরের জন্য আমি মণিটি চাই।"

জাম্ববান শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব, মহত্ত্ব ও অধ্যবসায়ে সন্তুষ্ট হইয়া কেবল স্যমন্তক মণিটি দিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের পরম রূপবতী মেয়ে জাম্ববতীর বিবাহও দিলেন! শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণি আর রমণীশিরোমণি জাম্ববতীকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

সভা বসিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই সভায় সত্রাজিৎকে ডাকাইলেন। কি ভাবে কোথা হইতে স্যমন্তক মণি পাইলেন,

সভায় রাজাদের কাছে সে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন ও সত্রাজিৎকে মণিটি দিলেন। সকলেই বুঝিল যে, শ্রীকৃষ্ণ দোষী নহেন, তিনি সত্রাজিতের ভাইকে বধও করেন নাই, মণিও চুরী করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের বৃথা কলঙ্কের মোচন হইল।

সত্রাজিতের কাছে চাহিয়াও শ্রীকৃষ্ণ মণি পান নাই। এজন্য বলরাম বড়ই রাগিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সেই রাগ দূর ও শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবার সত্রাজিৎও নিজের রূপবতী কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দিলেন—স্যমন্তক মণিটিও বিবাহে যৌতুক দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মণিটি লইলেন না—সত্রাজিৎকেই ফিরাইয়া দিলেন।

(২)

কিছুকাল পরে অক্রূর ও কৃতবর্ম্মার পরামর্শে শতধন্বা, সত্রাজিৎকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণি লইয়া পলাইল। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া শ্বশুরবধের প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন। শতধন্বা ভয়ে বিহ্বল হইয়া প্রথমে কৃতবর্ম্মার—শেষে অক্রূরের কাছে সাহায্য চাহিল! কিন্তু পরামর্শদাতারা এক্ষণে আর শতধন্বাকে সাহায্য করিতে রাজি হইলেন না।

শতধন্বা দেখিল যে বড়ই বিপদ্ উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিতই তাহাকে পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। কাজেই সে একটুমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্যমন্তক মণিটি অক্রূরের কাছে ফেলিয়াই পলাইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণও দাদা বলরামের

সহিত শতধন্বার পিছনে পিছনে যাত্রা করিলেন। শেষে মিথিলায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিলেন—কিন্তু তাহার কাছে মণিটি পাইলেন না।

"শতধন্বার কাছে স্যমন্তক পাওয়া গেল না" বলরাম শ্রীকৃষ্ণের এ কথায় বিশ্বাস করিলেন না—তাঁহার মনে হইল যে শ্রীকৃষ্ণ মণিটি গোপন করিতেছেন। পুনরায় মিথ্যা কলঙ্কে পড়িতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় চিন্তিত হইলেন—আবার দোষ ক্ষালনের জন্য উদ্যোগী হইলেন।

এদিকে শতধন্বার মরণের সংবাদ শুনিয়াই কৃতবর্ম্মা ও অক্রূর প্রাণভয়ে দ্বারকা ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। দ্বারকায় নানা প্রকার উপদ্রব আরম্ভ হইল। লোকজনেরা বলাবলি করিতে আরম্ভ করিল যে, ধার্ম্মিক অক্রূর দেশ ছাড়িয়া যাওয়াতেই এই সকল দৈবী আপদ্ ঘটিতেছে। এই আলোচনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে সন্দেহ হইল। তিনি বুঝিলেন যে স্যমন্তক মণিটি নিশ্চিতেই অক্রূরের কাছে আছে—উহা দূরে যাওয়াতেই দ্বারকার এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তখনি অক্রূরকে দ্বারকার ফিরাইয়া আনিলেন—শেষে নানা কথার পর কহিলেন—"অক্রূর! শতধন্বা তোমার কাছে স্যমন্তক মণিটি রাখিয়া গিয়াছে, তাহা আমি জানি—লোকে মনে করিতেছে—দাদারও সন্দেহ যে, আমিই উহা লুকাইয়া রাখিয়াছি। উহা যে সত্য নহে—সে কথা সকলকে জানান আবশ্যক। তুমি মণিটি সকলকে দেখাও।"

অক্রূর আর গোপন করিতে পারিলেন্ না, সেই সভার মধ্যেই সকলের সম্মুখে মণিটি বাহির করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে দেখাইয়া, উহা আবার অক্রূরকেই দিলেন। এই-রূপে দ্বিতীয় বারও শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যা কলঙ্ক দূর হইয়া গেল।

নষ্টচন্দ্র তিথিতে স্যমন্তক হরণের এই সকল কাহিনী শুনিলে মিথ্যা কলঙ্ক দূর হইয়া থাকে—তাই হিন্দুরা ভাদ্র-মাসের উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতে উহা শুনিয়া থাকেন।

স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত শুনিলেই যে কাহারো মিথ্যা কলঙ্ক দূর হয়, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিজের মিথ্যা কলঙ্ক দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন—সকলের মিথ্যা সন্দেহ দূর করিয়াছিলেন, সকলের পক্ষেই সেইরূপ প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের মিথ্যা কলঙ্ক দূর করা কর্ত্তব্য। তাহাই স্যমন্তক উপাখ্যান শুনিবার মূল উদ্দেশ্য।

কোজাগর

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমরা তখন ছোট্ট ছেলেটি ছিলাম। দুর্গোৎসব যাইতে না যাইতেই তখন আমরা কোজাগরের আনন্দ উৎসবের কল্পনায় মাতিয়া থাকিতাম।

আজকাল পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই হয়ত কোজাগর ব্যাপারটা কি তাহা জান না। আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে যে লক্ষ্মীপূজা হয়, উহারই এক নাম কোজাগর। এমন আনন্দের ব্যাপারটার অমন বিদ্‌ঘুটে নাম হইল কেন, সেকথাটা তোমাদের বলিতেছি।

পুরাণে লিখিত আছে যে,—আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথির নিশীথে লক্ষ্মীদেবী পৃথিবীতে বেড়াইতে আসেন। তিনি শুধুই বেড়াইতে আসেন না—তাঁর উদ্দেশ্য থাকে পৃথিবীর লোককে কিছু দান করা। এই জন্য তিনি এই রাত্রে বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখেন যে, কে কে ঐ রাত্রে জাগিয়া আছে, তাহারা কি করিতেছে? এই পূর্ণিমা রাত্রিতে যাহারা জাগিয়া থাকে, নারিকেলের জল পান করে—আর

পাশা খেলিয়া রাত কাটায়—লক্ষ্মীদেবী তাহাদিগকেই ধনসম্পদ্ দান করিয়া থাকেন।

'কো জাগর্ত্তি' অর্থাৎ কে জাগিয়া (সাবধান হইয়া) আছে, এই কথা হইতেই ইহার নাম 'কো-জাগর।' কো-জাগর রাত্রিতে নারিকেল ও চিপিটক (চিড়া) দ্বারা পিতৃগণের ও দেবগণের পূজা করিতে হয়। বান্ধবদিগকে উহাদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হয় এবং নিজেরও উহা খাইতে হয়।

পল্লীগ্রামে এখনও লক্ষ্মীপূজার পরদিন পাড়াপড়সীকে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষ্মীর প্রসাদ—নারিকেলের লাড়ু সন্দেশ চিড়া খৈ প্রভৃতি পরিতোষরূপে খাওয়ান হয়। ইহাকেও কোজাগর বা কোজাগরের নিমন্ত্রণ বলে। এখন ক্রমেই ব্যাপারটা কমিয়া আসিতেছে—নামটাও ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে।

এই তিথিতে প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীতেই লক্ষ্মীপূজা হয়—আর কমবেশি প্রসাদও বিতরণ হয়। এ পূজার আমোদটা তোমরাও সকলেই জান। তবে এখন আর শুধু নারিকেল চিড়া খাওয়া হয় না --নারিকেল জল পান করা হয় না—পাশা খেলিয়া রাত জাগা পনের আনা স্থলেই হয় না।

লক্ষ্মীপূজার আলিপনা (পিটুলিদ্বারা নানা চিত্র আঁকা) তোমরা জান। উহা একটা বেশ্ চিত্রবিদ্যা ছিল—এখন দায়শোধ গোছের কাজ হইয়াছে। দীপালীর মত এদিন

সন্ধ্যাকালেও বাড়ীময় প্রদীপ দেওয়া হয়। ঘরে সারারাত্রি দীপ জ্বালিয়া রাখিতে হয়।

শেষ কথা তোমরা মনে রাখিও;—আল্‌সের ঘরে লক্ষ্মী আসে না—যাহারা কর্ম্মপটু, নিরলস, মা লক্ষ্মী তাহাদিগকেই ধনসম্পত্তি দিয়া থাকেন।

গ্রহণ

গত ১৩২৯ সনের ৪ঠা আশ্বিন বৃহস্পতিবার সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল—পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই তাহা দেখিয়াছ। যাহারা কলিকাতায় বা গঙ্গার তীরে কোনও স্থানে ছিলে, তাহারা দেখিয়াছ যে, গ্রহণের সময়ে কতদূর হইতে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক পুরুষ আসিয়া ভক্তির সহিত গঙ্গায় স্নান করিয়াছে —কতলোক বা কতরকম যাগ যজ্ঞ পূজা বা জপতপ করিয়াছে।

খালি চোখে সূর্য্যের দিকে চাওয়াই যায় না। গ্রহণ হইলে সূর্য্যের তেজ কমিয়া যায়—চারিদিক আঁধার হইয়া আসে, তবু কিন্তু খালি চোখে তাহার দিকে চাওয়া যায় না— ধাঁধা লাগে। কাজেই অনেকে কাচের উপর কালি মাখাইয়া তাহার ভিতর দিয়া সূর্য্য দেখিয়া থাকে। উহাতে চোখে ধাঁধা লাগে না, অথচ বেশ্ আরামে—ঠাণ্ডা আলোতে সূর্য্য দেখা যায়—গ্রহণও স্পষ্ট দেখা যায়।

গ্রহণের ব্যাপার লইয়া আমাদের দেশের পুরাণে কতকগুলি উপাখ্যান আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এক সময়ে দেবতারা ও অসুরেরা মিলিয়া অমৃত পাইবার আশায়

সমুদ্র মন্থন করে। খুব মন্থন করার পর তো সমুদ্র হইতে অমৃতের কলসী উঠিল—আর দেবতারা তাহা লইয়া খাইবার উদ্যোগ করিলেন। সকলে সারি বাঁধিয়া বসিয়া গেলেন, বিষ্ণু স্বয়ং ভাণ্ড হাতে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবতাদের ইচ্ছা ছিল যে, তাহারা অসুরদিগকে অমৃতের ভাগ দিবেন না—নিজেরাই উহা খাইবেন। কিন্তু রাহু ও কেতু নামে দুইজন অসুর, দেবতাদের অমৃতের ফলারের ব্যাপারটার সন্ধান পাইয়া, দেবতার সাজে সাজিয়া, ফলারের মধ্যে বসিয়া গেল। রাহু আর কেতুর পাতেও অমৃত পড়িল -- তাহারা যেমন উহা মুখে দিয়া গিলিবে, অমনি চন্দ্র আর সূর্য্য এই দুই দেবতা রাহু আর কেতুর কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন—বিষ্ণু তো তখনই অসুর দুইটার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন। অমৃত খাওয়ার ফলে রাহু আর কেতুর মুণ্ড দুইটা অমর হইয়াছিল—দেহ নাশ পাইয়া গিয়াছিল। তাই ছবিতেও রাহু কেতুর মুণ্ডই শুধু আঁকা হয়। সেই থেকে রাহু আর কেতুর মুণ্ড চন্দ্র ও সূর্য্যকে গিলিতে আসে। ঐরূপ গিলিবার নামই গ্রহণ।

এ যে নিতান্তই গল্প—অশিক্ষিত জনসাধারণের মনোরঞ্জনের কথা, তাহাতে ভুল নাই। এদেশের প্রাচীন লোকেরা, গ্রহণ কেন হয়—তাহা বেশ জানিতেন। সে সম্বন্ধে তাঁহারা জ্যোতিষে বহুকথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, তোমাদিগকে এক্ষণে গ্রহণের ব্যাপারটা বলা যাইতেছে।

তোমরা দেখিতে পাও যে সূর্য্যের আলোতে বা চাঁদের জ্যোছনায় অথবা প্রদীপের আলোর সাম্‌নে কোন জিনিষ ধরিলে বা থাকিলে উহার উল্টা দিকে একটা ছায়া পড়ে। তোমরা যদি ঐ ছায়ার মধ্যে চক্ষু রাখিয়া দেখিতে চেষ্টা কর, তবে কিন্তু সূর্য্য চন্দ্র কিংবা প্রদীপ দেখিতে পাইবে না। ঐ ছায়াটা যে জিনিষের সেই জিনিষটাই সূর্য্য চন্দ্র বা প্রদীপটাকে আব্‌ডাল দিয়া রাখিবে। ছায়াটা খুব বড় হইলে আলোটা মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না ; আর ছায়াটা খুব ছোট হইলে আলোটার কতক ঢাকা পড়ে, বাকীটা দেখা যায়।

গ্রহণটা ঠিক এই প্রকারের ব্যাপার। সূর্য্য বা চন্দ্রের সাম্‌নে একটা কিছু আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই জিনিষটার ছায়ার ভিতর যাহারা পড়ে, তাহারাই সবটা সূর্য্য দেখিতে না পাইলে বলে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ, আর সবটা চন্দ্র দেখিতে না পাইলে বলে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ।

এখন কেমন করিয়া কোন জিনিষটা আসিয়া সূর্য্য বা চন্দ্রকে ঢাকিয়া দেয়, তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি।

তোমরা সূর্য্য বা চন্দ্রের উদয় আর অস্তের ব্যাপারটা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। যে দিন পূর্ণিমা সেদিন সূর্য্য পশ্চিম আকাশের নীচে ডুবিতে না ডুবিতেই যে পূর্ব্বের আকাশের ঠিক নীচের রেখাটিতে গোল রূপার থালার মত চন্দ্র দেখা দেয়, তাহা তোমরা অবশ্যই জান। পূর্ণিমার পর দিন চাঁদ পূবের আকাশে উঠিবার একটু আগেই সূর্য্য পশ্চিম

দিকে ডুবিয়া থাকে। এই ভাবে চাঁদের উদয় একটু একটু করিয়া পিছাইয়া যাইতে যাইতে পনর দিন পরে পূবের আকাশের নীচের রেখায় চাঁদের উদয় হয়—ঠিক সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, চন্দ্র ও সূর্য্য ভোরে পূবের দিকের আকাশে ওঠে, ক্রমে পশ্চিমে সরিতে সরিতে সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে ডুবিয়া যায়। অর্থাৎ উহারা যেন দিন রাত্রিতে একবার পৃথিবীর চারিদিকে ঘূরিয়া আসে। বাস্তবিক উহা সত্য নহে—তবু আমরা কথাটা বুঝিবার জন্য মানিয়াই লইলাম যে, চন্দ্র ও সূর্য্যই যেন পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে।

এক্ষণে এই ঘুরিবার ব্যাপারে দেখা যায় যে, সূর্য্য যতক্ষণে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসে, চন্দ্র ততক্ষণে ঘুরিয়া আসিতে পারে না। সে প্রতিদিন কতকটা পিছাইয়া পড়ে। এইরূপ পিছাইয়া পড়িতে পড়িতে শেষে একদিন সকাল বেলা দুজনে, ঠিক একই সময়ে পূবের আকাশে দেখা দেয়। দুপুরের রোদে যেমন জোনাকির আলো একেবারে ডুবিয়া যায়, তেমনি সূর্য্যের প্রচণ্ড আলোকমালার মধ্যেও চাঁদের আলো একেবারে ডুবিয়া যায়—দেখাই যায় না। পূর্ণিমার পনর দিন পরে এই ঘটনা ঘটে, ঐ দিনটির তিথির নাম অমাবস্যা।

অমাবস্যার দিন দুজনে যেমন একসঙ্গে উদিত হয়, তেমনি এক সঙ্গেই চন্দ্র সারাদিন সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে বলিয়া আমরা উহাকে দেখিতে পাই না।

কিন্তু বলিয়াছি তো সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র দৌড়িয়া পারে না, একটু পিছাইয়া পড়ে। অমাবস্যার পরদিন চাঁদকে দেখাই যায় না, তারপর দিন বা আরো একদিন পরে দেখা যায় যে সূর্য্য যখন অস্ত যায়, তখন পশ্চিমের আকাশের গায়ে রেখার মত এক টুক্‌রা চাঁদ দেখা দিয়াছে। এইরূপে চাঁদ রোজ রোজ একটু একটু করিয়া পিছাইতে থাকে, আর তার চেহারাটি একটু একটু করিয়া বাড়িতে থাকে। অমাবস্যার আটদিন পরে দেখা যায়, সূর্য্য যখন অস্ত যায়, তখন আধ-খানা চাঁদ ঠিক মাথার উপরের আকাশে দেখা দিয়াছে। এইভাবে চাঁদ বাড়িতে বাড়িতে অমাবস্যার পনর দিন পরে পূর্ণচন্দ্র হয়; আর সেদিন সে এত পিছাইয়া পড়িয়াছে যে, সূর্য্য যখন পশ্চিম আকাশে অস্ত গেল, পূর্ণচন্দ্র তখন পূবের আকাশে দেখা দিল।

এই ব্যাপার থেকেই বুঝিতে পারিতেছ যে, পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে চাঁদ থাকে পূবের আকাশে একেবারে নীচের রেখায়, আর সূর্য্য থাকে তার একেবারে উল্টাদিকে ঠিক পশ্চিম আকাশের নীচের রেখায়। আবার অমাবস্যার দিন দুইজনেই উদয়কালে থাকে ঠিক পূবের আকাশের নীচের রেখায়, আর অস্তকালেও থাকে পশ্চিম আকাশের নীচের রেখায়।

এখন এই চন্দ্র ও সূর্য্যের ঘুরাঘুরির আসল কথাটা বলিতেছি। আমাদের এই পৃথিবী থেকে চাঁদটা ২ লক্ষ ৪০

হাজার মাইল দূরে—আর সূর্য্য ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে। লাটিম যেমন নিজেই নিজের শলাকাটির উপর ঘোরে, সূর্য্যও তেমনি নিজেই নিজের অক্ষদণ্ড বা শলাকাটির উপর ঘোরে। পৃথিবীও লাটিমের মত নিজের শলার উপর ত ঘোরেই, তা' ছাড়া আবার সূর্য্যের চারিদিকেও ঘোরে। নিজের শলার উপর ঘুরিতে পৃথিবীর লাগে মাত্র ২৪ ঘন্টা বা ১ দিন রাত সময়; আর সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে লাগে ৩৬৫ দিনের উপর আরো কয়েক ঘন্টা সময়! এখন ব্যাপারটা বুঝিয়া দেখ!!

চাঁদটি যে সূর্য্য ও পৃথিবীর চেয়ে কেবল ছোট, তাহা নহে—সে পৃথিবীরই তাবেদার—অনুচর। সে বেচারা দিনরাত কেবল পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া পাহারা দেয়। পূর্ব্বে যে হিসাব দিয়াছি তাহাতেই বুঝিতে পারিতেছ যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য যতটা দূরে, সেই তুলনায় চন্দ্রকে পৃথিবীর কোলে বলিলেও বড় অন্যায় হয় না। কেননা পৃথিবী থেকে চাঁদ যদি থাকে একহাত তফাতে—তবে সূর্য্য থাকিবে ৬৮৭॥ হাত তফাতে!!

এখন একটা কথা তোমরা মনে কর যে, পৃথিবীতো বোঁ বোঁ করিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে—আবার চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। এখন ঐরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে চাঁদটা আসিয়া এক অমাবস্যার দিন—সূর্য্যের ঠিক সাম্‌নে —পৃথিবীর মুখোমুখি উপস্থিত হয়, কাজেই পৃথিবীর লোক সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আর সূর্য্য দেখিতে পায় না—চন্দ্র

মাঝখানটায় থাকিয়া মানুষের দৃষ্টিতে বাধা দেয়। চন্দ্র যদি সূর্য্যের সবটা ঢাকে তবে হয় পূর্ণগ্রহণ; অল্প ঢাকিলে হয় আংশিক গ্রহণ।

পাশের ছবিটি দেখিলেই সূর্য্যের গ্রহণ কিরূপে হয় বুঝিতে পারিবে। দেখ চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মাঝখানে রহিয়াছে। সূর্য্যের আলো চাঁদের গায় পড়িয়াছে, তাহাতে চাঁদের ছায়াটা ক্রমে সরু হইয়া পৃথিবীর গায়ের উপর দিয়া ঠিক ঈ স্থানে পড়িয়াছে। কাজেই এই ঈ স্থানের লোকেরা সূর্য্যকে মোটেই দেখিতে পাইতেছ না—অতএব এখানে সূর্য্যের পূর্ণগ্রহণ হইবে।

দেখ ঈগ ও ঈঘ স্থান দুইটিতে চাঁদের ছায়া তেমন গাঢ় নহে—পাতলা। কাজেই এই দুই স্থানের লোকেরা সূর্য্যের কতক অংশ আবছায়ায় ঢাকার মত দেখিতে পাইবে—ইহাও সূর্য্যগ্রহণ, কিন্তু আংশিক গ্রহণ। এই আবছায়াকে ভালকথায় বলে উপচ্ছায়া।

চাঁদ ঘুরিতে ঘুরিতে যেমন সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানটায় আসিয়া পড়ে, তেমনি পৃথিবীও সরিয়া যাইতে থাকে—স্থির থাকে না। সুতরাং প্রায়ই সূর্য্যের আংশিক গ্রহণ হইয়া থাকে। অমাবস্যা ছাড়া চাঁদ সূর্য্যের সাম্‌না-সামনি উদিত হয় না—তাই অমাবস্যা তিথি ছাড়া সূর্য্যগ্রহণ হইতেই পারে না।

ভূমিকম্প

গত ১৩৩০ সনের ২৩শে ভাদ্র রবিবার, শেষরাত্রে বাঙ্গালা ও আসামে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দেশের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। তার ৮।৯ দিন আগেই জাপান দেশে যে ভীষণ প্রলয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তা' তোমরা অনেকেই হয় তো বাপ-মা বা দাদাদিদিদের কাছে শুনিয়াছ। আজ পর্য্যন্ত ভূমিকম্পের যত বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে, তার মধ্যে জাপানের এই ভূমিকম্পই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এক সঙ্গে ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ও ঝটিকাপাত পৃথিবীর আর কোথাও হয় নাই।

জাপানের রাজধানী টোকিও ও ইয়াকোহামা নগরে এই দৈব উৎপাতে নাকি দেড়লক্ষ লোক মরিয়াছে—লক্ষ লক্ষ লোক জখম হইয়াছে, প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোকের ঘর দুয়ার সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে! আজ পর্য্যন্তও সব সংবাদ ঠিকমত পাওয়া যাইতেছে না।

ভূমিকম্প কেন হয় অনেক দেশেই সে সম্বন্ধে নানাকথা প্রচলিত আছে। সে সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি শুধুই গল্প—তার কোন সত্যতা নাই। আর আর গুলির বিষয়ও আজ পর্য্যন্ত কোন শেষ মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত হয় নাই।

ভূমি-তত্ত্বের পণ্ডিতগণ বহুবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া একটা কারণ বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর ভিতরে—গভীর তলে—

এখনও সব জিনিষ গলিয়া একেবারে জলের মত হইয়া আছে। ঐ তরল পদার্থের চারিদিকের অংশটা ঠাণ্ডা হওয়াতে জমিয়া শক্ত হইয়া মাটির আকার ধারণ করিয়াছে। সেই সকল তরল পদার্থের মধ্যে যদি কোন কারণে জল ঢুকিতে পারে, তাহা হইলে সেখানকার ভীষণ গরমে ঐ জল একেবারে ধূয়ার মত হইয়া যায়। আর উহা বাহির হইবার জন্য ভীষণবেগে শক্ত আবরণটার উপর ধাক্কা দেয়। উহাতেই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহাকেই ভূমিকম্প বলে।

পৃথিবীর যে স্থানে বহু আগ্নেয়পর্ব্বত আছে কিম্বা যে স্থান সমুদ্রের নিকবর্ত্তী সেই সকলস্থানেই বেশির ভাগ ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ভূমিকম্প হইলে অনেক সময় আগ্নেয় পর্ব্বতের গহ্বর দিয়া প্রভূত পরিমাণে গলিত ধাতু-দ্রব্যাদি ফোয়ারার জলের আকারে ছুটিয়া বাহির হয়। আবার আগ্নেয় পর্ব্বতে ঐরূপ ব্যাপার ঘটিবার সময়ও সেস্থানে ভূমিকম্প হইতে দেখা যায়। এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগ তরল ধাতব পদার্থে পরিপূর্ণ। উহাই সময় সময় পাহাড়ের গহ্বর দিয়া বাহির হয়—কখন বা বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া মাটিটা কাঁপাইয়া দেয়। আধুনিক পণ্ডিত-গণ আবার অন্য প্রকার অনুমানও করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবই অনুমানমাত্র—স্থির সিদ্ধান্ত এখনও কিছু হয় নাই।

শতবার্ষিক উৎসব

গত ১৩৩০ সনে—মাঘ মাসে দুইটি শতবার্ষিক উৎসব গিয়াছে। উহাতে বাঙ্গালী আর বাঙ্গলা দেশের বিশেষ গৌরবের বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। পাঠকপাঠিকারা সেই উৎসব দুইটির বিষয় জানিয়া রাখ।

সংস্কৃত কলেজ

ঠিক একশ বছর আগে—১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এদেশে রাজত্ব করিত কোম্পানী বাহাদুর। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিবার জন্যই এই কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথমে ৭৩ জন ছাত্র লইয়া কলেজের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। কলেজের জন্য প্রথম কলিকাতার বৌবাজার ষ্ট্রীটে—লালবাজারের কাছাকাছি—একটা বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। শেষে আড়াই বছর পর উহার জন্য বর্ত্তমান বাড়ী তৈয়ারী হয়—কলেজও এখানে চলিয়া আসে।

তখন কলেজের প্রধান কর্ত্তার নাম ছিল—প্রধান সেক্রেটারী। কাপ্তান উইলিয়াম প্রাইস্ কলেজের প্রথম সেক্রেটারী

হন। কলেজের বয়স ষোল বছর হইলে সেক্রেটারী হন রসময় দত্ত—ইহার দশ বছর পরে সেক্রেটারী হন—প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁহারই আমলে সেক্রেটারীর নাম
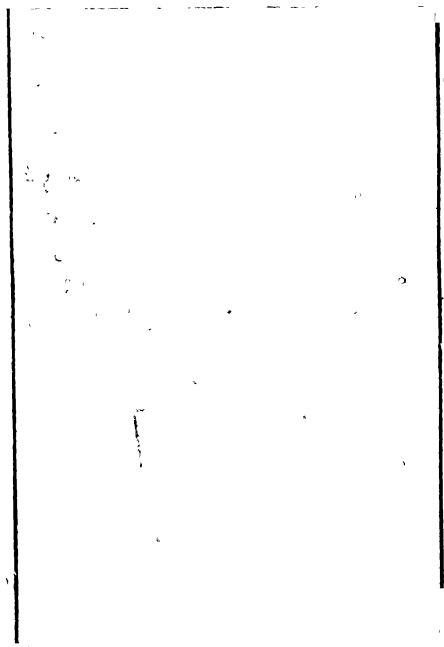
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হয় প্রিন্সিপাল। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হ'ন এবং আট বছর কার্য্য করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলে কলেজের বহুবিধ সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হয়।

তারপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গালীই ঐ পদে কার্য্য করিতেছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অবশ্যই গৌরবের কথা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সংস্কৃত কলেজ যে দিন স্থাপিত হয়—তাহার পঁচিশ দিন পরে যশোহর জিলার কপোতাক্ষ নদীর তীরে—সাগরদাঁড়ী গ্রামে মধুসূদন ভূমিষ্ঠ হ'ন। মধুসূদন বাপ-মায়ের একমাত্র জীবিত সন্তান। সুতরাং বড় আদরের দুলাল ছিলেন।

এখন যাহার নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ—গোড়ায় উহার নাম ছিল হিন্দু কলেজ। ১৮১৭ খৃঃ অব্দের ২০শে জানুয়ারী গরাণহাটা নামক পল্লীতে উহা স্থাপিত হইয়াছিল। মধুসূদন ১২।১৩ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন, পাঁচ বছরে এখানকার পড়া শেষ করেন। ১৯ বছর বয়সে মধুসূদন খৃষ্টান হইলেন—নাম হইল মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহার পর মধুসূদন শিবপুরের বিশপস্ কলেজে চারি বছব পড়িয়া হিব্রু, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি শিখিয়াছিলেন। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও পিতাই মধুসূদনের পড়ার খরচ যোগাইতেন। কিন্তু মধুসূদন এখান হইতে পলাইয়া মান্দ্রাজে চলিয়া গেলে—পিতা তাঁহার খরচ বন্ধ করিলেন। মধুসূদন তখন দারুণ অর্থের অভাবে পড়িলেন। সেই হইতে তাঁহার দুঃখের দিন আরম্ভ হইল।

নয় বছর পরে দেশে ফিরিয়া মধুসূদন বাঙ্গালায় পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার প্রথম পুস্তক

'শর্ম্মিষ্ঠা'। তারপর পদ্মাবতী নাটক ও দু'খানা প্রহসন লিখেন। ইহার পর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে

মাইকেল মধুসূদন

রচনা করেন। ইহাতে মধুসূদনের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। উহার পরই রচিত হয়—মেঘনাদ বধ। ইহা-

দ্বারাই তিনি বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে অদ্বিতীয় ও চিরজীবী হইয়াছেন। পরিশেষে কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়া তিনি অতিশয় যশোলাভ করেন।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রহণ, ইংরেজের কন্যা বিবাহ, খৃষ্টান ও ইংরাজগণের মধ্যে বাস করিলেও, মধুসূদন বাঙ্গালায় বহি লিখিলেন—তাহাও আবার হিন্দুর পূজা, উৎসব, স্বদেশভক্তির বিষয় লইয়া। ইহা আশ্চর্য্য নহে কি? তোমরা বড় হইয়া মধুসূদনের বহি পড়িলে দেখিবে যে—উহা মধু অপেক্ষাও কত মধুর, উহার লেখা কত জোরাল। তিনি প্রাণ দিয়া দেশকে ভালবাসিতেন—জাতিকে ভালবাসিতেন—মাতৃভাষাকে ভালবাসিতেন। তোমরা মাইকেলের এই গুণগুলি অবশ্যই গ্রহণ করিবে।

মাঘোৎসব

পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে যাহারা সহরের স্কুলে পড়, তাহারা নিশ্চয়ই প্রতি বছর মাঘমাসের ১১ই তারিখে ছুটি পাও। ঐ ছুটির নাম মাঘোৎসবের ছুটি। মাঘোৎসব কি, কিরূপে উহার উৎপত্তি হইল, তাঁহা হয়ত অনেকে জান না, তাই আজ তোমাদের কাছে সে কথাটা বলিব।

খানাকুল কৃষ্ণনগর হুগলী জিলার একটি গ্রাম। উহার নিকটেই রাধানগর নামে আর একটি গ্রাম আছে। এই রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। রামমোহনের পিতা ছিলেন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, আবার তাঁহার মাতামহ শ্যাম ভট্টাচার্য্য ছিলেন শাক্ত। মা-বাপের কার্য্য দেখিয়া শিশু বয়সে রামমোহন প্রগাঢ় ভক্তিপরায়ণ হন। গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের প্রতি রামমোহনের অতিশয় ভক্তি ছিল।

যৌবনে রামমোহন সংস্কৃত শিখিবার জন্য কাশীতে পড়িতে যান। তথায় শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া এবং বেদ পড়িয়া তাহার মনে হয় যে, প্রচলিত ধর্ম্ম বড়ই আড়ম্বরপূর্ণ ও কৃত্রিম। নিজের মনের কথা সরলভাবে যখনই তিনি প্রকাশ করিলেন—তখনই পিতা রামকান্ত রায় বিরক্ত হইয়া

পুত্র রামমোহনকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। রাম-মোহন ভারতের নানাদেশ, তিব্বত প্রভৃতি বেড়াইয়া গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে পিতার সহিত একমতাবলম্বী না হওয়াতে পুনরায় গৃহহইতে বিতাড়িত হইলেন।

কয়েকবছর ইংরাজ সরকারের চাকরি করিয়া রামমোহন তাহা ত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি বঙ্গভাষায় প্রচুর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তিনি নানা ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া অনেক পুস্তক প্রকাশ করেন।

চাকরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিবার সময় তিনি নিজের মতানুসারে ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্য মাণিকতলা নামক পল্লীতে নিজের গৃহে একটি সভা স্থাপন করিয়া উহার নাম রাখেন 'আত্মীয়সভা।' এই সভা সপ্তাহে একদিন বসিত; উহাতে বেদ পাঠ ও ধর্ম্ম সঙ্গীত হইত। ইহার তের বছর পর তিনি একটি 'উপাসনা সভা' স্থাপন করেন। স্থায়িভাবে উপাসনামন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে উক্ত অর্থদ্বারা চিৎপুরের রাস্তার পারে ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহ প্রস্তুত হয়।

'ব্রাহ্মসমাজ মন্দির' প্রস্তুত হইলে—মাঘমাসের ১১ই তারিখ সেই গৃহের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়—ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য আরম্ভ হয়। তদবধি প্রতি বছর ১১ই মাঘ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীরা ঐ তারিখে উপাসনা, পাঠ, উপদেশদান, কীর্ত্তন প্রভৃতি

নানাপ্রকার ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আনন্দে দিবস অতিবাহিত করেন। উহারই নাম মাঘোৎসব।

রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। সমাজের বয়স একশত বৎসর হইবার অনেক আগেই তাহা তিন খণ্ডে

বিভক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক অংশের নাম 'আদি সমাজ'—ইহাই প্রথম প্রতিষ্ঠিত। এই আদি সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এক সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন,– তাহার নাম 'নববিধান' সমাজ। কিছুকাল পরে মতের মিল না হওয়াতে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি মিলিয়া অপর এক সমাজ স্থাপন করেন। এই শেষোক্ত সমাজের নাম "সাধারণ সমাজ"।

রাজা রামমোহন কিংবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতি-ভেদ অস্বীকার কিংবা বর্ণাশ্রমের চিহ্ন উপবীত প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিতেন না। পরবর্ত্তী সমাজ কিন্তু জাতিভেদ মানে না। অনেকে মনে করেন যে, রাজা রামমোহন ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ রহিত করেন—তাহা ঠিক্ নহে। তিনি নিজে বিলাত গিয়াছিলেন—ইউরোপের কোন কোন দেশে যাইয়া বিশেষ সম্মানও লাভ করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি তাঁহার উপবীত ত্যাগ করেন নাই। মরণকাল পর্য্যন্ত তাঁহার গলায় পৈতা ছিল। রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁহার মৃতদেহ ইংলণ্ডে সমাহিত হয় এবং তাঁহার শেষ চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার পাগড়ী ও উপবীত দেশে ফিরাইয়া আনা হয়। উহা এখনো কলিকাতার 'রামমোহন লাইব্রেরী' নামক গৃহে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। যে কেহ সেখানে গেলেই রাজার এই শেষ চিহ্ন দেখিতে পারে।

খেলাধূলা

সাঁতার

যে সকল জায়গা বর্ষাকালে ডুবিয়া যায় বা যে স্থানে নদীর সংখ্যা বেশি, সে সকল স্থানের লোক সাধারণতঃই সাঁতার শিখিয়া থাকে। সহরের লোক সচরাচর সাঁতার জানে না। কিয়ৎকাল যাবৎ কলিকাতায় কয়েকটা 'সাঁতার-সমিতির' প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সকল সমিতির ছেলেদের মধ্যে কয়েকদিন পূর্ব্বে একটা প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। অনেক বালক সাঁতারের প্রতিযোগিতায় বেশ্ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। সব চেয়ে বেশি বাহাদুরী দেখাইয়াছিল অপর পৃষ্ঠায় যাহার ছবিটি দেখিতেছ সেই বালকটি। ইহার নাম—শ্রীমান্ শিবরাম বসু, বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। শ্রীমান্ আধমাইল সাঁতার কাটিয়া সকলকে অবাক্ করিয়া দিয়াছে। আমরা এই সকল কার্য্যের বিশেষ সমর্থন করি। যে সাঁতার জানে, সে যে কেবল জলে পড়িলে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহা নহে, জলে পতিত অপর লোককেও উদ্ধার করিতে

পারে। স্থতরাং প্রত্যেক বাঙ্গালীর ছেলের সাঁতার শিক্ষা করা **উচিত।**

কাগজে তোমরা চূণার হইতে কাশী পর্য্যন্ত পনর মাইলের সাঁতারে বাঙ্গালীর ছেলেরা যে প্রথম হইয়াছিল,

শ্রীমান্ শিবরাম বস্থ

সে সংবাদ পড়িয়াছ। কলিকাতার সন্তরণ-প্রতিযোগিতায়ও বাঙ্গালীই প্রথম হইয়াছে।

গত ১৩৩০ সনের ৬ই আশ্বিন রবিবার, একটা সাঁতারের প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। উহাতে ৪৬ জন লোক খড়দহ

হইতে কলিকাতায় রওয়ানা হয়। তাহাদের ৪ জন আরম্ভেই থামিয়া যায়, আর সকলে কলিকাতায় আসে। খড়দহ হইতে কলিকাতা ১৩ মাইল। এই প্রতিযোগিতাতে কলেজ স্কোয়ারে যিনি প্রথম হইয়াছিলেন—সেই শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষই প্রথম হ'ন। বাঙ্গালীদের সহিত ষ্ট্রাথ্ নামে ক্যামেরণ হাইলেণ্ডার্স দলের এক সাহেব ছিল। সে দ্বিতীয় হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল সকলের শেষে।

(২)

ইণ্ডিয়ান্ লাইফ সেভিং সোসাইটির উদ্যোগে চন্দ্রনগর হইতে আহিরিটোলা পর্য্যন্ত আবার ২২ মাইল সন্তরণের প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। সাঁতারের দিন বেলা ১টার সময় চন্দ্রনগর বারদোয়ারী ঘাট হইতে সাঁতার আরম্ভ হয়। প্রত্যেক সন্তরণকারীর সঙ্গে একখানি পান্সি নৌকায় জীবন-রক্ষক অ্যাম্বুলেন্স প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গার দুইধার লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। সোসাইটীর উদ্যোগে ৪।৫ খানি ষ্টীমার সন্তরণকারীদের সঙ্গে আসিতে-ছিল। প্রায় দুইশত পান্সী ও ডিঙ্গী নৌকায় বহু ভদ্রলোক ঐ সন্তরণ দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলেন।

খড়দহের সম্মুখস্থ গঙ্গায় পৌঁছিলে পর ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বড় বড় ঢেউয়ের ঘাত প্রতিঘাতে সন্তরণকারীরা

বড়ই কষ্টবোধ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধঘণ্টাকাল ঝড়বৃষ্টি হওয়ার পর গঙ্গা শান্তভাব ধারণ করে।

একটা দশ মিনিটের সময় সাঁতার আরম্ভ করিয়া—ঠিক ছয়টা সাত মিনিটের সময় আশুতোষ দত্ত আহেরীটোলার ঘাটে আসিয়া পোঁছিলেন। কাশীপুরের নিকট হইতে দেখা গেল, সহরের সকল লোক যেন গঙ্গার ধারে যাইয়া জমা হইয়াছে। গঙ্গাবক্ষ দর্শকপূর্ণ ষ্টীমার ও নৌকায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আহিরীটোলা ঘাটে সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, যতীন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দশজন সন্তরণ-কারী আহিরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া পোঁছিয়াছিলেন। নিম্নে কয়েকজনের নাম দেওয়া হইল।—

প্রথম – শ্রীআশুতোষ দত্ত—ইণ্ডিয়ান্ লাইফ্ সেভিং সোসাইটীর সভ্য, বয়স ১৭ বৎসর।

দ্বিতীয়—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল, কলিকাতা সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব, বয়স ২৬ বৎসর।

তৃতীয়—কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাশী আর, আই, এসো-সিয়সান, বয়স ১৮ বৎসর।

চতুর্থ—মাণিকলাল দত্ত, কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাব, বয়স ২৫ বৎসর। তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তি একই সময়ে ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

(৫) হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, বয়স ২২ বৎসর।

(৬) সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা সুইমিং ক্লাব, বয়স ২১ বৎসর।

(৭) হীরালাল গাঙ্গুলী, কলিকাতা ইউরেকা স্পোর্টিং ক্লাব, বয়স ১৭ বৎসর।

বাঙ্গালার প্রত্যেক বালক, কিশোর ও যুবক সাঁতার শিখিয়া আত্মরক্ষা ও পররক্ষায় নিপুণ হউক, ইহা আমরা কামনা করি।

বিদ্যার দৌড়

এক ছিল ব্রাহ্মণ। সংসারে তাঁর স্ত্রী ও একটি ছেলে ছাড়া আর কেহ পোষ্য ছিল না। গ্রামে ও ভিন্নগ্রামে কয়েক ঘর অবস্থাপন্ন যজমান ছিল, তাঁদের বাড়ীর—বারমাসে তের পার্ব্বণ করাইয়া ব্রাহ্মণের দিন গুজরান হইত। সংসারে তিনটী মাত্র প্রাণী, তাই এক রকম সুখেই তাঁহাদের দিন কাটিতেছিল। ছেলেটি বড় হইয়াছে—যজমান বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্ম করাইয়া দুপয়সা আয় করিতে পারিলে—সংসার আরো স্বচ্ছল হইবে ভাবিয়া, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী মনে মনে বেশ্ একটু আনন্দই ভোগ করিতেছিলেন।

ব্রাহ্মণের ছিল এক সহপাঠী। তার সঙ্গে টোলে তাঁহার ভাব হয়, ক্রমে তাহা আত্মীয়তায় পরিণত হয়। সহপাঠী ছেলেটি যেমন ছিল লেখা-পড়ায় খুব ভাল, তেমনি ছিল বুদ্ধিমান্—তার উপর আবার বাড়ীর অবস্থা ছিল আরো ভাল। অতিথি অভ্যাগতকে খাওয়ান, বার্ষিক দোল—দুর্গোৎসবাদি তাঁহাদের বাড়ীতে বেশ্ সমারোহেই চলিত।

ব্রাহ্মণ টোলের পড়া শেষ করিবার পরই নিজে আগু হইয়া কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ দিলেন ঐ সহপাঠীর সঙ্গে। পাঠ্যজীবনের প্রণয়টুকু কুটুম্বিতায় পরিণত হইল। আপদে বিপদে—সুখসম্পদে ভগিনীপতির পরামর্শ লইয়া ব্রাহ্মণ বেশ্ নিশ্চিন্তেই সংসার চালাইয়া লইতেছিলেন।

ব্রাহ্মণের ছেলেটি বড় হইয়াছে—টোলে পাঠাইয়া তাহাকে সংস্কৃত শিখান হইতেছে। সংস্কৃতে বেশ্ একটু জ্ঞানও হইতেছে। ব্রাহ্মণ মাঝে মাঝে ছেলেকে দু'চার কথা জিজ্ঞাসা করেন। ছেলের উত্তর শুনিয়া আনন্দে ও আশায়—তাঁহার বুকটা ভরিয়া উঠে। কিন্তু ছেলের সাম্‌নে সে ভাব চাপিয়া যান।

পূজা আসিতেছে। এক যজমান বাড়ী নূতন পূজা আরম্ভ হইবে। ব্রাহ্মণ ছেলেকে পূজায় ব্রতী করাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। অন্ততঃ চণ্ডীটা পাঠ করিতে পারিলেও যা হয় একটা আয় হইবে ভাবিয়া তিনি ছেলেকে চণ্ডী অভ্যাস করিতে দিলেন। আর বলিয়া দিলেন—"বাবা, বেশ্ মন দিয়া—অর্থ বুঝিয়া চণ্ডী অভ্যাস করিবে।" ছেলে চণ্ডী পুঁথি বগলে লইয়া টোলে চলিয়া গেল।

পূজা ঘনাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে। ছেলে আর বাড়ী আসে না—বাপ-মা ভাবিতেছেন, ছেলে এবার বেশ্ ভাল করিয়া চণ্ডী অভ্যাস করিয়া আসিবে। কিন্তু কল্পারম্ভের যখন আর একদিন বাকী, তখন ত আর দেরী করিলে চলে

না; কাজেই ব্রাহ্মণ একজন প্রতিবেশীকে পাঠাইলেন— ছেলেকে বাড়ী লইয়া আসিতে। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে প্রেরিত লোকের সহিত ছেলে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

ছেলে পাইয়া কোথায় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর আনন্দ হইবে, তাহাতো না, ছেলের রকম সকম দেখিয়া ব্রাহ্মণের তো চক্ষু স্থির! ছেলে বাড়ীতে আসিয়াই বাপের সঙ্গে দিল বিষম কোন্দল জুড়িয়া। চণ্ডীপাঠ করা শিক্ষিত ছেলে, বুড়া বাপকে চায় বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতে! বিপদে পড়িয়া ব্রাহ্মণ ছেলের কাছে ব্যাপারটা জানিতে চাহিলেন—ছেলে তৎক্ষণাৎ জোর গলায় বলিয়া উঠিল—"আমিত আর মূর্খ নই। চণ্ডী পড়িয়াছি—বেশ ভাল করিয়া অর্থ বুঝিয়াছি— তাহাতেই তো লেখা আছে—

সর্ব্ব মা-পো ময়ং জগৎ—অর্থাৎ সকল সংসারে 'মা' আর 'পো' ছাড়া আর কেহ কিছুই নয়! তবে তুমি কে যে এবাড়ীতে থাকিবে? ভাল চাও তো আর কথাটি না বলিয়া সুর-সুর করিয়া নিজের পথ দেখ। এ বাড়ীতে মা আর পো ছাড়া আর কারোর জায়গা নাই—হবেও না।"

পুত্রের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া ব্রাহ্মণ তো একেবারে হতভম্ব—যেন সাতহাত জলের তলে ডুবিয়া পড়িলেন। পুত্রের এ ব্যাধির কি চিকিৎসা, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে পড়া ও সুখ-দুঃখের সঙ্গী ভগিনীপতিকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। নিজে আহারনিদ্রা ছাড়িয়া সারা রাত

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কত কি ছাইভস্ম ভাবিতে লাগিলেন।

রাত পোহাইল। দিনশেষেই কল্পারম্ভ। ব্রাহ্মণের ভাবনার আর কুল-কিনারা নাই। বেলা যখন দুপুর তখন ব্রাহ্মণের ভগিনীপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাহার কাছে উপস্থিত বিপদের কথা বলিতে না বলিতেই—লোকের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিদ্বান্ পুত্রটি সদম্ভে ও সরোষে সেখানে উপস্থিত হইল। আর কঠোরস্বরে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি আমার বাড়ীতে কথা বলিবার কে মশায়? চণ্ডীতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে—'সর্ব্ব মা-পো ময়ং জগৎ।' মা আর পো ছাড়া সংসারে আর কেহ কিছু নয়।"

ব্রাহ্মণের ভগিনীপতি ছিলেন খুব বুদ্ধিমান্—আর বিদ্বান্। তিনি শ্যালকপুত্রের কথা শুনিয়াই চট্ করিয়া বলিলেন,—"বাপু চণ্ডী পড়িয়াছ বটে, কিন্তু সবটা ভাল করিয়া পড় নাই। তা যদি পড়িতে, তবে আর শুধু ওই কথাটা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে না—আর কাহাকে তাড়াইতেও আসিতে না। চণ্ডীর শেষ দিকটা কি পড় নাই? সেখানে যে লেখা আছে—

'তত্রাপিসা নিরধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা!' তবে বাপু পিসা ছাড়া চলে কৈ! আমি যে তোমার পিসা গো! তা কি ভুলিয়া গেলে!!"

ছেলের একবার জ্ঞান হইল। তখন নিজের মূর্খতা বুঝিয়া

পিসার কথা মানিয়া সে চণ্ডী বগলে লইয়া গামোছা কাঁধে যজমান বাড়ী চলিল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহাদের বুক হইতে ভাবনা ও ভয়ের জগদ্দল পাথর নামিয়া গেল।

আদর্শ বীরনারী

কর্ম্মদেবী

(১)

রাজপুতনার একাংশের নাম যোধপুর—উহারই অপর নাম মারবার। আজকাল ব্যবসায় বাণিজ্যে যে মারোয়ারী-দিগের নাম সকলের মুখে মুখে শুনা যায়, তাহারা ঐদেশের লোক। বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে যেমন বলে বাঙ্গালী, তেমনই মারবারের অধিবাসীদিগের নাম মারবারী।

মারবারেরই একটী ক্ষুদ্র প্রদেশের নাম ঔরিণ্ড। যে সময়ের কথা বলিব, সে সময়ে ঔরিণ্ডের যিনি শাসনকর্ত্তা বা মালিক ছিলেন তাহার নাম ছিল মাণিক রাও; ইনি মোহিলা নামক সম্প্রদায়ের রাজা বা সর্দ্দার। এইজন্য তাঁহাকে মোহিলরাজ বা মোহিল সর্দ্দার বলিত। মাণিক রাওয়ের একটী কন্যা জন্মে—তাহার নাম রাখা হয় কর্ম্মদেবী। কন্যার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ। মাণিক রাওও

ছেলের তুল্য আদর ও যত্নে কর্ম্মদেবীকে পালন ও শিক্ষাদান করিলেন। রাজপুতজাতির জাতীয় ধারা অনুসারে—কর্ম্মদেবী অশ্বারোহণ এবং অস্ত্র চালনায়ও বেশ্ নিপুণা হইলেন। ক্রমে ক্রমে কর্ম্মদেবী যৌবনে পদার্পণ করিলে, তাঁহার রূপের খ্যাতির সহিত তাহার গুণের খ্যাতিও চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। পিতা মাণিক রাও কন্যাকে পাত্রসাৎ করিবার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

রাজপুত জাতি ছত্রিশটা কুল বা বংশে বিভক্ত। তাহার মধ্যে রাঠোর বংশ অতিশয় সম্মানিত। উহা শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভট্টি নামক এক ব্যক্তি হইতে আর একটি কুলের নামও হয় ভট্টি। ইহারাও বীর বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মাণিক রাও যখন মেয়ের বিবাহের কথা ভাবিতেছিলেন, তখন একদিন, ভাটের মুখে—মুন্দর রাজ্যের অধিপতি রাঠোররাজ চণ্ডের চতুর্থ পুত্র অরণ্যকমলের শৌর্য্যবীর্য্য ও রূপের কথা শুনিতে পাইলেন। প্রাণাধিকা কন্যা কর্ম্মদেবীর ইনিই উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া তিনি অরণ্যকমলের সহিত মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। রাজ্যের সকলেই এই সম্বন্ধের বিষয় জানিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই—মাণিক রাওয়ের গৃহে এক অতিথি উপস্থিত হইলেন। অতিথির নাম সাধু—বয়সে

যুবক। তিনি কেবল নামে সাধু নহেন—সরলতা, নম্রতা, বিনয় এবং সত্যবাদিতায় তিনি যথার্থই সাধু।

রাজপুতনায় যশল্মীর নামে যে দেশ আছে, তাহার অধীনে পুগল একটী প্রদেশ। পুগলের রাজা ভট্টি বংশ সম্ভূত—নাম রণঙ্গদেব। রণঙ্গদেব একজন প্রসিদ্ধ প্রজাপালক রাজা। তাহার পুত্রের নাম সাধু—ইনিই মাণিক রাওয়ের গৃহে অতিথি হইলেন।

সাধুর ন্যায় বাহুবলশালী বীর—তখনকার দিনে খুব কমই দেখা যাইত। ইনি ছিলেন দুর্ব্বৃত্ত ও দুষ্টের যম। মরুস্থলীর লোক সকল তখন সাধুর বীরত্ব ও বিচারের বিষয় স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত। একদা মরুস্থলীর একটা নগর হইতে সাধু নিজ রাজধানীতে ফিরিতেছিলেন। ফিরিবার পথেই ঔরিণ্ড প্রদেশের পশ্চিম ভাগ। পুগলরাজকুমার রাজ্যমধ্য দিয়া যাইতেছেন—এই সংবাদ জানিবামাত্র মাণিক রাও তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সাধু-স্বভাব সাধু পরম সমাদরে ঔরিণ্ডরাজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া—তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

রণঙ্গদেব, মাণিক রাওয়ের বন্ধু। সুতরাং বন্ধু-পুত্রকে আপন পুত্রের ন্যায় তিনি পরম স্নেহের সহিত গ্রহণ করিলেন। সাধু ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অভ্যর্থনার জন্য ঔরিণ্ডরাজধানী সুসজ্জিত এবং প্রচুর পান ভোজনের ব্যবস্থা হইল। সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া মহাপ্রাণ সাধুও পিতৃবন্ধুকে

পিতৃতুল্য সম্মান দিয়া রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। সাধুর নাম ও বীরত্বের কথা আগেই সকলে শুনিয়াছিল,—এক্ষণে তাঁহার উন্নত বীরদেহ ও কার্ত্তিকের তুল্য রূপ দেখিয়া ঔরিণ্ড নগরবাসীরা চমৎকৃত হইয়া গেল। সাধুর রূপ ও গুণের আলোচনায় রাজধানী মুখর হইয়া উঠিল।

মাণিক রাও পুগলকুমার সাধুকে লইয়া নানা কথায় ব্যস্ত হইলেন। সাধু একে একে নিজের জীবনের বহু ঘটনার বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন। সেই সকল কাহিনীতে ভট্টিবীর সাধুর সাধুতা, উদারতা, বীরত্ব, চতুরতা প্রভৃতির জ্বলন্ত বর্ণনা ছিল। মোহিলরাজ কখনও সাধুর অপূর্ব্ব সমর-কৌশলের কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত, কখনও বিপদের বার্ত্তা শুনিয়া চমকিত, কখন বা করুণ কাহিনী শুনিয়া মমতায় গলিয়া যাইতেছিলেন। বন্ধু পুত্রের গৌরবের কাহিনীতে নিজকেও যেন গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন।

এই বীরত্ব কাহিনী শুনিবার জন্য মোহিলরাজের প্রাণাধিকা কন্যা কর্ম্মদেবীও তথায় উপস্থিত ছিলেন। বীরের মুখে তাঁহার বীরত্ব কাহিনী শুনিতে শুনিতে বীর রমণী কর্ম্মদেবী জগৎ সংসার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বর্ণনা তাহার কানে অমৃত ঢালিয়া দিতেছিল।

রাজপুত রমণী—রূপের বা ধনৈশ্বর্য্যের কাঙ্গালিনী নহে। তাহারা যেমন বীরের গৃহে জন্মগ্রহণ করে,—শৈশব হইতে শৌর্য্যবীর্য্যের কথাই শুনিয়া থাকে,—তেমনি যৌবনে

তাহারা চাহে বীর স্বামী,—প্রৌঢ়ে চাহে বীর পুত্র। বাস্তবিক বীরের পত্নী এবং বীরের মাতা হইতে পারিলেই রাজপুতানীরা নিজকে ধন্য মনে করে। কর্ম্মদেবী রাজকুমারী হইলেও কখনও ভোগৈশ্বর্য্য বা বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দেন নাই। বরং পিতার সুশিক্ষায় স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্র চালনা ও অশ্বারোহণে পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং যৌবনে যে তিনি বীর পুরুষকে স্বামী পাইবার আশা করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাস্তবিক, তিনি লোকমুখে পুগল রাজপুত্র সাধুর অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া, তাঁহাকেই স্বামী পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে পিতা, মুন্দরপতি রাও চণ্ডের চতুর্থ পুত্র অরণ্যকমলের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কাপুরুষ না হইলেও অরণ্যকমল সাধুর মত বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ নহেন,—সাধুর ন্যায় তাঁহার বীরত্ব কাহিনী লোকমুখে শুনাও যায় নাই। তাই কর্ম্মদেবী, পিতার স্থির করা সম্বন্ধে তেমন সুখী হইতে পারেন নাই। বিবাহের আয়োজনেও কাজেই তাঁহার মনে বিশেষ আনন্দ বা চাঞ্চল্য উপস্থিত করিতে পারে নাই। তিনি অপর দশ জনের মতই বিবাহের কথা শুনিয়া ও আয়োজন দেখিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ— সেই চিরবাঞ্ছিত বীর—পুগল রাজতনয় সাধু আসিয়া অতিথি হইলেন ঠিক্ কর্ম্মদেবীরই পিতৃগৃহে। নাম ও গুণের কথা শুনিয়া কর্ম্মদেবী একান্ত হৃদয়ে যাঁহার অনুরাগিণী

হইয়াছিলেন—আজ আপন গৃহে তাঁহার সাক্ষাত পাইয়া আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেলেন। যাঁহাকে দেখেন নাই—তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষের সকল সন্দেহ ঘুচিল,—যাঁহার কথা পরের মুখে শুনিয়া অন্তঃকরণ ভক্তি শ্রদ্ধায় ভরিয়াছিল—তাঁহারই মুখে তাঁহার নিজের কাহিনী শুনিয়া কর্ম্মদেবীর কর্ণ পরম পরিতৃপ্ত হইল। সূর্য্যোদয়ে দীপশিখা যেমন গুপ্ত হইয়া পড়ে—তেমনই সাধুর সাক্ষাৎকার পাইয়া কর্ম্মদেবীর হৃদয় হইতে অরণ্যকমলের নামটি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া চলিল। চুম্বক পিণ্ডের সম্মুখে—লৌহখণ্ডগুলি যেমন অসম্ভবরূপে চঞ্চলতা প্রকাশ করে, আজ সেইরূপ—ধীরা স্থিরা অচঞ্চলা কর্ম্মদেবী অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

সাধুর কথা শুনিয়া সকলে অতিশয় তৃপ্ত হইলেন। কর্ম্মদেবীও নীরবে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। বাস্তবিক আয়নাতে যেমন সকল জিনিষের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনই মানুষের মুখে তাহার হৃদয়ের সকল ভাবের প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে। কর্ম্মদেবী মুখে কিছু না বলিলেও মুখমণ্ডলের ভাব দেখিয়া সখীরা তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। রাজপুত্রীও প্রিয় সহচরীদিগের কাছে কোন কথা গোপন করিলেন না।

রাজা স্বয়ং যে সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহা ফিরাইয়া সাধুর সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না,—সাধু সামান্য প্রদেশাধিপতির পুত্র – আর অরণ্যকমল বংশ-মর্য্যাদায় ও ঐশ্বর্য্যে কত বড়

তাহা সখীরা বর্ণন করিল। কিন্তু বীররমণীর হৃদয় রাজসিংহাসনের লোভে বা বংশ-মর্য্যাদায় মুগ্ধ হইল না। কর্ম্মদেবী স্পষ্ট করিয়া কহিলেন,—"রাজসিংহাসন অতি তুচ্ছ, রাঠোর কুল উচ্চ বটে, কিন্তু উচ্চ বংশের বধূ হইয়াই বা লাভ কি? আমি যাহাকে মন প্রাণ দিয়াছি—তাঁহার দাসী হইয়া থাকাও ভাল, তথাপি অন্যের মহিষী হওয়া কিছু নহে।"

কন্যার মত শুনিয়া প্রথমে রাজা ও রাণী বিশেষ চিন্তিত হইলেন,—কেননা রাঠোর বংশের সহিত সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলে তাঁহার রাজ্য রক্ষা পাওয়া দায় হইবে; অপর দিকে সে সম্বন্ধ স্থির রাখিলে প্রাণাধিকা কন্যার শোচনীয় পরিণাম ঘটিবে,—এই উভয় চিন্তায় তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত হইলেন। শেষে কন্যার মননই স্থির রহিল। মাণিক রাও সাধুর করেই কন্যাদান করিতে স্থির-নিশ্চয় হইলেন।

আহারাদি শেষ হইল—সকলে বিশ্রাম ও বিশ্রম্ভালাপ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মাণিক রাও সাধুর কাছে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন—রাঠোর বংশের সহিত কন্যার বিবাহ না দিলে ঔরিণ্ডের যে বিপদ্ ঘটিতে পারে, সে কথাও কহিলেন।

সকল কথা ধীরভাবে শুনিয়া সাধু কহিলেন,—"যদি পুগলে যথারীতি নারিকেল ফল পাঠাইয়া সম্বন্ধ উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারি।" সাধু পিতৃরাজ্য পুগলে ফিরিয়া গেলেন।

ঔরিণ্ড হইতে নারিকেল ফল পাঠাইয়া, সাধুর সহিত কর্ম্মদেবীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করা হইল।

কয়েক দিনের মধ্যেই মহা সমারোহে বিবাহ কার্য্য শেষ হইল। বিবাহে বিপুল যৌতুক দেওয়া হইল। তাহার মধ্যে অসংখ্য মণিরত্ন, বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র, একটি স্বর্ণ ষাড় এবং কর্ম্মদেবীর সহচরীরূপে তেরটি রাজপুত যুবতী ছিল। সাধু যৌতুক দ্রব্যাদি সহ পুগলে যাত্রা করিলেন।

কন্যা বিদায়ের কালে মাণিক রাওয়ের মনে সহসা রাঠোর রাজ্যের কথা জাগিল। ঔরিণ্ড হইতে পুগলে যাইতে পথে বা কোন বিপদ্ ঘটে, সেই ভাবনায় তিনি জামাতার সহিত চারি হাজার বাছা বাছা মোহিলা সৈন্য দিতে চাহিলেন মহাবীর সাধু সেকথায় কর্ণপাতই করিলেন না। তিনি নিজের বাহুবল ও সঙ্গীর সাতশত ভট্টি সৈন্যই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিলেন। সাধুর বীরত্ব এবং ভট্টি সৈন্যের আত্মত্যাগের কথা জানিয়াও মাণিক রাও নিঃশঙ্ক হইতে পারিলেন না, মোহিলা সৈন্য লইবার জন্য জামাতাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাধু অবশেষে—ঠিক যাত্রা কালে আপন শ্যালক মেঘরাজ ও তাঁহার অধীন পাঁচ শত সৈন্য সঙ্গে করিয়া পুগলে রওয়ানা হইলেন। চন্দন নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এদিকে ঔরিণ্ডের বিবাহের সংবাদ মুন্দরে পৌছিল। সংবাদ শুনিয়া অরণ্যকমল বুঝিলেন যে তাঁহার অবস্থা

শিশুপালের মত হইয়াছে। তখন ক্রোধে তিনি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইলেন! সাধুকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য সসৈন্যে তাঁহার পুগল যাইবার পথের ঘাটি দখল করিয়া রহিলেন। সাধুর শত্রুদের কেহ কেহও আসিয়া রাঠোর রাজকুমারের সহিত যোগ দিল। এই মিলিত শত্রুদলও চন্দনার নিকটবর্ত্তী স্থানেই উপস্থিত ছিলেন।

অরণ্যকমলের সৈন্য সংখ্যা, সাধুর সৈন্য অপেক্ষা তিনগুণ বেশি। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের লোক বাহুবলেরই গৌরব করিত,—এখনও বাহুবলকেই তাহারা বড় বলিয়া মনে করে। সুতরাং সৈন্যবলের সহায়ে শত্রুকে পরাস্ত করা অপেক্ষা নিজ বাহুবলে শত্রুকে পরাস্ত করা গৌরবের বিষয় ভাবিয়া, অরণ্যকমল সাধুর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইচ্ছুক হইলেন। রাঠোর রাজকুমারের মর্য্যাদা রক্ষার্থ সাধু তাহাতে সম্মতি দিলেন।

তুই পক্ষের বাছা বাছা সর্দ্দার দ্বন্দ্বযুদ্ধে আগুয়ান হইল। অপর সৈন্য সকল দূরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রের কিছু দূরে একখানা সুসজ্জিত রথ,—বিবাহের বস্ত্র মাল্য চন্দনে সজ্জিতা কর্ম্মদেবী তাহাতে বসিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে সাধুর সহচর জয়টঙ্গার সহিত অরণ্যকমলের দলস্থ চৌহান বীর যোধের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু ক্ষণমধ্যেই জয়টঙ্গার অসির প্রচণ্ড প্রহারে ঘোড়াসহ যোধকে যমালয় যাইতে হইল। যুদ্ধে জয়ী জয়টঙ্গার তখন

মত্ততা উপস্থিত ; সুতরাং সে আপনার যোগ্য মনে করিয়া রাঠোর পক্ষের অনেক বীরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ইহাতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ভাঙ্গিয়া গেল—দল-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বৃথা কতকগুলি নিরপরাধ লোকের প্রাণ যাইবে ভাবিয়া, এবার অরণ্যকমল ও সাধু স্বয়ং দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

অরণ্যকমলের একটী প্রিয়তম বাহন ছিল। সেই ঘোড়ার নাম পঞ্চকল্যাণ। যুদ্ধক্ষেত্রে সে তাঁহার চালক সহচর ও রক্ষক। রাঠোর রাজকুমার পঞ্চকল্যাণের পিঠে ভীষণ সংহার মূর্ত্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইলেন এবং সাধুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তাঁহার মুখে দারুণ জিঘাংসার চিহ্ন, বক্ষে প্রচণ্ড রোষাগ্নি, হস্তে দ্বিধার ভীষণ অসি দিনমণি-কিরণে দীপ্ত—আর পঞ্চকল্যাণ শত্রুশিরে পড়িবার জন্য উদ্যত। সাধুকে চিনিতে পারেন নাই বলিয়াই অরণ্যকমল তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। এদিকে সাধুও যুদ্ধের জন্য সতত প্রস্তুত। তথাপি আজ একটু বন্ধন আছে,—তাই তিনি নববিবাহিতা পত্নীর কাছে বিদায় লইতে গেলেন।

বীরবালা—বীরবনিতা—আজীবন বীরত্বের উপাসিকা কর্ম্মদেবী অচঞ্চল ধীরগম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, আপনি সেই কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হউন—আমি এই রথে বসিয়াই আপনাদের সমর দর্শন করিব। আপনি জয়ী হউন, শত্রু সংহার করুন ইহাই কামনা করি ; তথাপি

যদি যুদ্ধে আপনার পতন হয়, তবে আমিও আপনার অনুগমন করিব।”

পত্নীর প্রেরণায়—সাধুর হৃদয়ে অসীম সাহস ও বাহুতে প্রচণ্ড বলের আবির্ভাব হইল। তিনি যমদণ্ড তুল্য ভীষণ শূল উদ্যত করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন! সুতীক্ষ্ণ শূলের আঘাতে অসংখ্য শত্রু সৈন্য সমরক্ষেত্রে শয়ন করিল। এবার রাঠোর রাজকুমার শত্রুর পরিচয় পাইলেন,—অমনি প্রভুর ইঙ্গিতে পঞ্চকল্যাণ সাধুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। মরণ মুখে দাঁড়াইয়াও দুই বীর শিষ্টাচার ছাড়িলেন না! উভয়ে উভয়কে মর্য্যাদা অনুযায়ী সম্ভাষণাদি করিয়া লইলেন। তারপর দুইজনে—পরস্পরের প্রতি শত্রুতা সাধনে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষের সৈন্যদল নিজ নিজ প্রভুর জয়নাদে রণস্থল মুখর করিয়া তুলিল। প্রতিপক্ষ বীরদ্বয় সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া জয়াভিলাষে—সুকৌশলে আত্মরক্ষা ও শত্রুসংহারে যত্ন করিতে লাগিলেন। উভয়ের ঘোড়ার খুরের আঘাতে মাটি ধূলিতে পরিণত ও ধূলিতে যুদ্ধক্ষেত্র আঁধার হইয়া উঠিল। কেবল চপলা চমকের ন্যায় বীরদ্বয়ের তরবারির ঝলক্ দর্শকদিগের দৃষ্টিপথে পড়িতে লাগিল। সহসা সাধু, অরণ্যকমলের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি প্রহার করিলেন; কিন্তু চতুর রাঠোর বীর নিমেষে তাহার প্রতিরোধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাধুর শিরে তরবারি দ্বারা প্রচণ্ড প্রহার করিলেন। কিন্তু

পরস্পরের আঘাতে পরস্পরকেই বজ্রাহত গিরিচূড়ার মত ভূমিতে পড়িতে হইল। দর্শকেরা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে অরণ্যকমল ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু সাধু আর উঠিলেন না—তাঁহার চেতনাও চিরতরে লুপ্ত হইয়া নিভিয়া গেল। যুদ্ধ থামিল, রাঠোরের জয়নাদ ও ভট্টির ক্রন্দন কোলাহলে আবার যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল।

স্বামীকে সমরে বিদায় দিয়া কর্ম্মদেবীর চিত্ত নানা সন্দেহের দোলায় ছুলিতেছিল। একদিকে সংসারের সুখ ভোগ—স্বামীর সোহাগ, অপর দিকে বীর রমণীর কঠোর কর্ত্তব্য—বিদায় মুহূর্ত্তের শেষ প্রতিজ্ঞা। সংসার সুখ অপেক্ষা কর্ত্তব্যই কর্ম্মদেবীর কাছে অধিকতর শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হইয়াছিল—তাই তিনি পাষাণ মূর্ত্তির মত যুদ্ধ দেখিতে ছিলেন—শেষ ফলের আশায় উদ্গ্রীব ছিলেন। এক্ষণে শেষ ফল দেখিয়া অচলমূর্ত্তি সচল হইল, নীরব মুখে রা ফুটিল। তাঁহারা সদ্য বাসরবেশ শ্মশান সজ্জায় পরিণত হইল—কিন্তু তাহাতে তিনি অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি সঙ্গীদিগকে চিতাশয্যার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন।

প্রভুর প্রাণত্যাগে ভট্টিবীরেরা মুহূর্ত্তের জন্য বিমর্ষ হইলেন; তারপর প্রভুপত্নীর আদেশ পাইয়া তাহাদের সেই বিমর্ষ ভাব অরুণোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় লুপ্ত হইয়া গেল। তাহারা মহোৎসাহে চিতাশয্যার আয়োজন করিতে লাগিল।

এদিকে কর্ম্মদেবী জনৈক সৈনিকের কাছে একখানা তীক্ষ্ণধার অসি চাহিলেন। ভট্টিসেনা অশঙ্কচিত্তে তাহা প্রভুপত্নীকে প্রদান করিল। কর্ম্মদেবী অসি লইয়া কি করেন, সৈন্যগণ যেন সেই অজ্ঞাত বিষয়ের ভাবনায় নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া অপলকদৃষ্টিতে তাহা দেখিতে লাগিল।

তীক্ষ্ণধার অসি শক্ত করিয়া ধরিয়া কর্ম্মদেবী আপন দক্ষিণ বাহু এক আঘাতে কাটিয়া ফেলিলেন। বিবাহের শুভমঙ্গল সূত্র ও অলঙ্কার সহ ছিন্ন বাহুখানা রথোপরি গড়াগড়ি করিতে লাগিল। কর্ম্মদেবী নিকটস্থ এক সৈনিককে অকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—"এই লও বীর! তোমার প্রভুপত্নীর চিহ্ন। ইহা আমার পিতৃতুল্য শ্বশুর মহাশয়কে দিও—দিয়া জানাইও যে তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপ ছিল।"

সৈনিক, প্রভুপত্নীর আদেশ পালন করিল।

এবার কর্ম্মদেবী, রথ হইতে আপনার বাঁ হাত বিস্তার করিলেন এবং নিকটস্থ এক মোহিলা সৈনিককে আদেশ করিলেন, "আমার এই হাত ছেদন কর—।" বলিতে বলিতে কর্ম্মদেবীর মুখমণ্ডলে এমন একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃরেখা ফুটিয়া বাহির হইল যে, তাহা দেখিয়া সৈনিকের মুখে আর কোন কথা বাহির হইল না। সে মন্ত্রচালিতের মত সুতীক্ষ্ণ অসির এক আঘাতেই হাতখানা কাটিয়া ফেলিল। এবার দর্শকমণ্ডলী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু

কর্ম্মদেবী—মহিমামণ্ডিত বীরপত্নী বিন্দুমাত্র বিষণ্ণ না হইয়া পুনরায় ধীরগম্ভীর ভাবে সেই সৈনিককে আদেশ করিলেন,—"এই লও আমার হাত—ইহা মোহিলা কুলের ভট্ট কবিকে দিবে।"

তারপর তিনি অকম্পিত পদে চিতায় আরোহণ করিয়া স্বামীর মৃতদেহ বক্ষে লইয়া শয়ন করিলেন। নিমেষে হুতাশন লক্‌লক্ রসনা বিস্তার করিয়া বীর-দম্পতির দেহ গ্রাস করিয়া ফেলিল।

বাহুদ্বয় যথাকালে যথাস্থানে পাঠান হইল। পুগলপতি রণঙ্গদেব প্রাণাধিকা কন্যার বাহু বহু মান ও পরম স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়া দগ্ধ করিলেন। দাহস্থানে একটা সরোবর করান হইল—তাহার নাম রাখা হইল **"কর্ম্মদেবী সরোবর"**।

ভারতের সতী ও বীরাঙ্গনার পরিচয় প্রদান করিবার জন্য আজিও সেই সরোবর বর্ত্তমান আছে।

কর্ম্মদেবী

(২)

দিল্লীশ্বর আকবর চিতোর আক্রমণ করিলেন। চিতোর-পতি উদয়সিংহ অমনি অস্তমিত হইলেন। কিন্তু চিতোর রাজপুত জাতির প্রাণ। উদয়সিংহ তাহা ত্যাগ করিলেও অপরাপর রাজপুতেরা তাহাকে ছাড়িতে পারিল না—।

কেহ না ডাকিলেও চারিদিক্ হইতে রাজপুত রাজারা সৈন্য-সামন্ত লইয়া চিতোর রক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বেদনোরের অধিপতি জয়মল এবং কৈলওয়ার রাজ্যের শাসনকর্ত্তা পুত্তই সমধিক প্রসিদ্ধ। আজিও রাজপুতনার অনেক দেশের লোক প্রাতঃকালে এই দুই মহাবীরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া থাকে।

চিতোরের প্রধান প্রবেশ-পথের নাম সূর্য্যতোরণ। যিনি প্রথমে এই তোরণ পথ রক্ষা করিতেছিলেন, তিনি সমরে প্রাণত্যাগ করিলে বীর যুবক পুত্ত আসিয়া তোরণ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন।

দেশের বিপদে কেবল যে পুরুষেরাই অগ্রসর হইতেন, তাহা নহে,—রাজপুত রমণীরাও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আবশ্যক হইলেই ভীষণ ভৈরবী মূর্ত্তিতে রণক্ষেত্রে দেখা দিতেন। বর্ত্তমান ১৩৩৭ সন হইতে ৩৬৩ বৎসর আগে চৈত্র মাসের ১২ই তারিখ রবিবার, চিতোর যুদ্ধে ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

দুর্গরক্ষক বীরবর জয়মল গুপ্ত-ঘাতকের গুলিতে নিহত হইলেন। একমাত্র ষোড়শবর্ষীয় বীর পুত্তের উপর তখন চিতোর রক্ষার গুরুভার পতিত হইল। পুত্ত-জননীর নাম কর্ম্মদেবী। পুত্তের পিতাও চিতোর রক্ষা করিতে আসিয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। পুত্ত তখন নিতান্ত শিশু, তাই কর্ম্মদেবী পুত্রের পালন ভার লইয়া বাঁচিয়া আছেন—সহমরণে যান

নাই। পুত্ত কিছুকাল পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছে,—বধূর নাম কমলাবতী; পুত্তের কনিষ্ঠ সহোদরা কর্ণবতী, অবিবাহিতা। সে ভ্রাতৃবধূর সমবয়সী। জয়মলের মরণে পুত্ত বিশেষ চিন্তিত হইলেন, কিন্তু ভীত হইলেন না। প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

যুবক বীরের অপূর্ব্ব বীরত্বে রাজপুত সৈনিকগণের দেহে যেন অযুত হস্তীর বল সঞ্চারিত হইল। তাহাদের প্রচণ্ড আক্রমণে সম্রাটের সেনাদল সমূলে নাশ পাইতে বসিল। রাজপুতের প্রহারে তাহারা পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিল।

এদিকে ব্যাপারের গুরুত্ব দেখিয়া পুত্তের জননী অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতেছিলেন। প্রাণাধিক পুত্রের অসামান্য যুদ্ধ-কৌশল ও বীরত্ব দেখিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ ও উদ্দীপন বাক্য কহিতে লাগিলেন।

ওদিকে মোগল সম্রাট্ রাজপুতদিগকে একবারে চূর্ণবিচূর্ণ করিবার আশায় আপন সৈন্য দলকে দুইভাগ করিলেন। একভাগ তোরণ সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, অপর ভাগ লইয়া তিনি স্বয়ং অন্য পথে চিতোরে প্রবেশ করিতে চলিলেন। কর্ম্মদেবী এই কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, সম্রাট্কে বাধা দিতে না পারিলে চিতোরের আর উপায় নাই। তিনি দ্রুতগতি ঘোড়া ছুটাইয়া গৃহে ফিরিলেন। হায়! ঘরে তখন একটী মাত্র রাজপুত, এমন কি, একটি চাকর পর্য্যন্ত নাই। বীরমাতা তাহাতেও দমিলেন না,

তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ হাতে কন্যা ও পুত্রবধূকে যুদ্ধের সাজে সাজাইয়া ঘোড়ায় চড়াইলেন। রমণীত্রয় নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বেলা তখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর।

চিতোরের পার্শ্বস্থ একটি সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ কষ্টে দুটি লোক সে পথে অগ্রসর হইতে পারে! পথের মাঝে মাঝে আবার বেশ্ মোটা মোটা গাছ ও লতা রহিয়াছে। কন্যা ও বধূর কচি কোমল দেহ বর্ম্মে আচ্ছাদিত, হস্তে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া কর্ম্মদেবী এই গিরিপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার বাঁ পাশে কন্যা কর্ণবতী ও ডান পাশে বধূ কমলাবতী ঘোড়ার পিঠে পথ আগ্লাইয়া দাঁড়াইলেন। দূরদর্শিনী বীরমাতা শুনামাত্রই বুঝিয়াছিলেন—যে তোরণ এবং এ পথ ছাড়া চিতোরে ঢুকিবার আর কোন পথ নাই। সুতরাং তিনি আসিয়া এই পথ মুহূর্ত্ত মধ্যে দখল করিয়া রহিলেন। সম্রাট্ সৈন্যসহ সেই পথে আসিয়াই দেখিলেন, তিনটী স্ত্রীলোক তাহার বিপুল সৈন্যদলের পথ আগ্লাইয়া দণ্ডায়মান। আকবরের অধর প্রান্তে একটু হাসির বিকাশ হইল। কেননা একদিকে মোগলের অযুত সৈন্য—পরিচালক স্বয়ং আকবর—অপর দিকে তিনটি মাত্র রমণী; তাহাদের দুইটি আবার কিশোরবয়স্কা।

সম্রাট সৈন্যদিগকে গিরিপথে অগ্রসর হইতে হুকুম করিলেন। মোগল সেনা ঘোড়ায় চড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু রমণী তিনটীর প্রচণ্ড পরাক্রমে তাহাদিগকে

হটিতে বা প্রাণ দিতে হইল! দেখিয়া সম্রাট বিস্মিত হইলেন !! কিন্তু উপায় কি ? যে রমণী তিনটী মোগলের বিপুল বাহিনীর সম্মুখে বাধাদানে দণ্ডায়মানা—তাঁহারা আজ কেবল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই এহেন কাজে আগুয়ান হইয়াছেন। তন্মধ্যে বৃদ্ধা যিনি, তিনি বীরজায়া ও বীরজননী—যুদ্ধ ব্যাপার এবং স্বদেশ ও পুত্রের বিপদ তিনি বেশ্ বুঝেন। অপর দুইজন যুদ্ধ না জানিলেও অস্ত্র ও অশ্ব চালনা করিতে জানেন। তার উপর একজনের সহোদর ও অপরের প্রাণপতি যুদ্ধক্ষেত্রেও বিপন্ন! সুতরাং তাহারা জীবনের মায়া না করিয়া শত্রু নিপাতে অগ্রসর হইলেন। বেলা শেষ হইয়া আসিল, সূর্য্য মাথার উপর হইতে ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেন—কিন্তু নারী তিনটি তেমনি অটল অচল নির্ভীক রহিয়া পদে অশ্ব তাড়না ও হস্তে অস্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন। যে মোগল সেনা গিরিপথে অগ্রসর হইল সে-ই ভূতলশায়ী হইল; অথচ গিরিপথের গাছ ও লতা মোগলের গুলি গোলা হইতে রমণী ত্রয়কে রক্ষা করিতে লাগিল।

ব্যাপার দেখিয়া বিরাট বাহিনীপতি আকবর লজ্জায় মুখ নীচু করিলেন—স্ত্রীলোক তিনটিকে যে জীবিত ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে হাজার আস্রফি (মোহর) পুরস্কার দিবেন—প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু শার্দ্দূলীত্রয়কে ধরিতে কাহারও সাধ্য হইল না।

ক্রমে বেলা শেষে কর্ণবতী ভূপতিত হইলেন—স্বদেশের

স্বাধীনতা রক্ষণকামা জননী সেদিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। কারণ এই সুযোগে পাছে মোগল সেনা অগ্রসর হয়—গিরিপথ অতিক্রম করে ? তবে যে চিতোর যাইবে—মিবার যাইবে—পুত্র পুত্তের প্রাণ এবং রাজস্থানের স্বাধীনতা লোপ পাইবে ! ভূপতিতা কন্যা ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—"মা চলিলাম !"

যুদ্ধক্ষেত্র মাতৃস্নেহের স্থান নাই। জননী পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া—পায়ে ঘোড়া ও হাতে অস্ত্র চালাইতে চালাইতে—বিন্দুমাত্র মুখ না ফিরাইয়া কহিলেন,—"যাও মা—আমিও আসিতেছি !"

এই সময়ে একটি বন্দুকের গুলি আসিয়া বধূ কমলাবতীর বাম বাহু ভেদ করিল। কিশোরী তাহাতে তিলমাত্র টলিল না। সে ডান হাতে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। কিন্তু সমুদ্রের বন্যাব মুখে তৃণের বাঁধ কতক্ষণ টিকে ? সারাদিন যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে কমলাবতী ও কৰ্ম্মদেবী ভূতলে পতিত হইলেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পুত্ত আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। জননী ও পত্নীর হত্যাকারীর শির তৎক্ষণাৎ দেহচ্যুত করিলেন। দেখিতে দেখিতে কমলাবতীর প্রাণ দেহ ছাড়িল—সে স্বামীর কাছে শেষ বিদায় চাহিয়া লইল। পুত্ত সেকথা শুনিলেন মাত্র। কৰ্ম্মদেবী, পুত্তকে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেন, ইহা শোকের বা দুঃখের সময় নহে বলিয়া উপদেশ দিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণবায়ুও অনন্তে মিশিয়া গেল।

পুত্রের সহিত চিতোরের আট হাজার রাজপুত—সতরশ' আত্মীয় স্বজন, নয়জন মহিষী, পাঁচজন রাজকন্যা, তুইটি শিশু প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আগুনে পুড়িয়া মরিলেন।

মৃত রাজপুতগণের গলা হইতে পৈতা খুলিয়া লইয়া ওজন করাতে ৭৪॥০ মণ হইল। আকবরের আদেশে সেই হইতে পত্রের অপর পৃষ্ঠে ৭৪॥০ লিখিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। উহার অর্থ—মালিক ব্যতীত অপর কেহ পত্র খুলিলে তিনি চিতোর নাশের পাপে পাপী হইবেন।

কর্ম্মদেবী

(৩)

শত শত বৎসর পূর্ব্বে রাজপুতনায় আর এক কর্ম্মদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি ছিলেন মেবারের রাণা সমর-সিংহের জ্যেষ্ঠা মহিষী—পৃথ্বীরাজের ভগিনী পৃথার সতীন, পত্তনের রাজকন্যা। ইহার ছেলের নাম কর্ণ।

মহম্মদ ঘোরী দ্বিতীয়বার পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিল। মেবাররাজ—পৃথ্বীর ভগিনীপতি সমরসিংহ আসিয়া এই বিপদে পৃথ্বীর পাশে দাঁড়াইলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না—তলাওয়ারীর যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়কেই

মুসলমানের অস্ত্রে প্রাণ দিতে হইল। ১১৯২ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে।

শিশুপুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া কর্ম্মদেবী সহমরণে যাইতে পারিলেন না। তিনি কর্ণকে মেবারের সিংহাসনে বসাইয়া বেশ্ নিপুণতার সহিত রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজা শিশু—পরিচালন ভার একজন নারীর উপর। ইহাই সুযোগ মনে করিয়া দিল্লীর মুসলমান রাজা কুতুবউদ্দিন্ মিবার আক্রমণ করিলেন—অগণিত সৈন্য আসিয়া মিবারপ্রান্তর ছাইয়া ফেলিল। এ সংবাদ যখন রাজসভায় আসিল, তখন নিদারুণ বিপদের ভাবনায় সকলেরই মুখ কালিমায় ঢাকিয়া গেল। কর্ম্মদেবী কিন্তু সংবাদ শুনিয়া শার্দ্দূলীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তিনি কোনরূপেই—সমরসিংহের সাধের মেবার মুসলমানের হাতে তুলিয়া দিতে রাজী হইলেন না। স্বয়ং মুসলমানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য অভিলাষিণী হইলেন। তিনি স্পষ্টই বলিলেন,—"সমরসিংহ মুসলমানের যুদ্ধে জীবন দিয়াছেন সত্য—তাঁহার মহিষী ত মরে নাই? রাজপুতবাণীর বাহু এখনও বলহীন হয় নাই।"

রাজপুত জাতি অতি অপূর্ব্ব স্বভাবের। অমন রাজভক্ত জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। কর্ম্মদেবীর বীরোক্তি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রাজপুত জাতির শিরায় শিরায় তপ্তরক্ত

ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। নয়জন হিন্দু রাজা আসিয়া এই মহিমময়ী রাণীর সহায় হইলেন। কর্ম্মদেবী উহাদের এবং রাহৎ উপাধিধারী এগারটী মাত্র সৈনিক লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং সেনা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। সৈন্য সংখ্যা অল্প হইলেও রাণীমাতার উৎসাহে ও পরিচালনে রাজপুতগণের বাহুতে ভীমবল দেখা দিল, প্রচণ্ড বিক্রমে তাহারা মুসলমান সেনার উপর আপতিত হইলেন। কুতুবউদ্দিনের সৈন্যদল সেই প্রচণ্ড আক্রমণ সহিতে পারিল না—ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। দিল্লীপতি মুসলমানরাজ হিন্দুনারীর বাহুবলের কাছে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

শেষ